মুখোমুখি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

BENGALI EBOOK
2021

সূচিপত্র

দাম্পত্য.....2
মুখোমুখি.....19
সহাবস্থান.....39

www.bengaliebook.com

দাম্পত্য

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয় রমেনবাবুর। খাটুনির জীবনে এইটুকুই বিলাসিতা। আজ চোখ মেলে তাকিয়েই তার মনে হল কোথায় যেন এই সকালটার একটু ব্যতিক্রম অনুভব করছেন। বিছানায় শুয়েই চারদিকে তাকালেন। সামনের ছোট টেবিলে ট্রে-তে বেড-টি পট আর পেয়ালা। গত পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি বেড-টি খেয়েছেন মনে পড়ে না। তার আগে অবশ্য ঘুম-চোখে এক পেয়ালা চা কোনরকমে গলাধঃকরণ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চোখ মেলে ভালো করে তাকাতেনও না। সুমিত্রার তাগিদে উঠছি উঠছি করে মাথার ওপরের পাখার হাওয়ায় চা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে দুচুমুকে পেয়ালা শেষ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চা সমস্তদিনে রমেন চৌধুরী অনেকবার খান। কিন্তু ওই সাতসকালে সুমিত্রার তাকে চা গেলানোটা বিরক্তিকর লাগত। না খেলে, সেও যেন কালচারের হানি। রমেনবাবু অবশ্য কখনো এ নিয়ে আপত্তি করেননি। আজ থেকে বাইশ বছর আগে সুমিত্রা এ বাড়িতে পা-দিয়ে যা-কিছু করেছেন তার সব কিছুই তখন রমেনবাবু অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন। তাই পরে আর আপত্তির। কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু পাঁচ মাস বাদে রঘু ব্যাটা ভুল করে আবার চায়ের ট্রে রেখে গেছে বোধহয়। পরক্ষণে নিজের গায়ের পাতলা চাদরটার দিকে চোখ গেল। ভোরের দিকে এখন সামান্য ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়ে। তার মধ্যে মাথার ওপর পুরোদমে পাখা ঘোরে। ভোররাতে বেশ শীত করছিল রমেনবাবুর মনে আছে। কিন্তু ঘুম-চোখে পায়ের তলার চাদরটা আর খুঁজে পাননি তিনি।

রঘুটা সেদিন চাদর দিতে ভুলেছে ভেবে কুঁকড়ে শুয়েছিলেন আবার। কিন্তু এখন নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা দেখছেন। ঘুমের মধ্যে। আবার কখন উঠে চাদর হাতড়ে পেয়েছেন এবং গায়ে দিয়েছেন মনে করতে পারছেন না।

আরো অবাক সামনের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তে। রঘু ভুল করে না। হয় বেড-টি রেখে গেল, কিন্তু দরজা দুটোও খোলা রেখে গেল? তাছাড়া

তার ঘুমের মধ্যেই দরজায় পাট-ভাঙ্গা নতুন পর্দা লাগিয়ে দিয়ে গেল? ও-রকম মুগোরঙ্গের পর্দাগুলো সব সুমিত্রা নিয়েই গেছে ধরে নিয়েছিলেন। কারণ গত পাঁচ মাসের মধ্যে মাঝে একবার মাত্র এই ঘরের পর্ণা বদলানো হয়েছে, মনে পড়ছে। তাও রঘু নিজের পছন্দমতো ভারী একটা নীল পর্দা এনে লাগিয়েছিল। গত তিন মাস ধরে সেই পর্দাই ঝুলছিল। কি ভেবে বালিশের ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে পিছনের জানলা দুটোর দিকে তাকালেন রমেনবাবু। তার পরেই হাঁ একেবারে। দরজায় ওই মুগোপর্দা লাগালেই তার সঙ্গে ম্যাচ করে জানলায় ওই রংয়ের পর্দাই টাঙাতো সুমিত্রা। এখনো জানলায় সেই ম্যাচ করা ঝকঝকে পর্দাই দেখছেন রমেনবাবু। তিনি ঘুমুচ্ছেন আর সেই ঘরে ঢুকে রঘু নিঃশব্দে এত সব করে গেল দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

আস্তে আস্তে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। ঘরের চারদিকে ভালো করে তাকালেন আবার। ড্রেসিং টেবিলটা সাজানো, কোণের আলনাটা গোছানো। পাঁচ মাস আগে যেমন থাকত, সে রকমই অনেকটা।

ঘড়ি দেখলেন। নটা বাজে প্রায়। এত বেলা পর্যন্ত আগে ঘুমোতেন না তা বলে। ইদানীং বেলা হচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়েন বা জার্নাল-টার্নাল পড়েন। রাতের ঘুম কমেছে, ফলে সকালের ঘুম বেড়েছে।

-বাবা এখনো ওঠেনি রে রঘু?

বাইরে থেকে এই গলার শব্দ কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা যেন ধপধপ করে লাফিয়ে উঠল রমেনবাবুর। একি শুনলেন তিনি? কার গলা শুনলো? এখন তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন?

ওই গলার স্বর যার, সে পর্দা ঠেলে গলা বাড়ালো। তাকে বসে থাকতে দেখে মুখে হাসি ভাঙল। দুচোখ আনন্দে চকচক করছে।

সুমু– সৌমেন, রমেনবাবুর একমাত্র ছেলে। কুড়ি বছর বয়স। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একমুখ হেসে বাবাকে প্রণাম করল। বলল, খুব অবাক করে দিয়েছি তো? মা একটা চিঠি লিখে তোমাকে জানাতে বলেছিল আমরা

আসছি। আমি বলেছি, না, যাচ্ছি যখন না জানিয়েই যাবো। বাবাকে অবাক করে দেব।

ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রমেনবাবু। বুকে চেপে ধরলেন। তারপর কি যে হয়ে গেল, নিজেও অপ্রস্তুত। যা কখনো হয়নি তাই হয়ে গেল। কেঁদে ফেললেন তিনি।

বাবার চোখে জল দেখে ছেলেটাও অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আর কিছু ভেব না বাবা। সব ঠিক হয়ে গেছে। মা আর তোমাকে ছেড়ে যাবে না, আমিও না। কি যে এক মজার কাণ্ড হয়েছে না মাদ্রাজে–একদিনে মায়ের মেজাজ জল– মনই ঘুরে গেল একেবারে, বলবখন তোমাকে–চুপ মেরে যেতে হল, পর্দা সরিয়ে সুমিত্রা ঘরে ঢুকলেন। বাপে-ছেলেতে তখনো জড়াজড়ি, রমেনবাবুর চোখে তখনো জল।

তাড়াতাড়ি ছেলেকে ছেড়ে দিলেন। নিজের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল রমেনবাবুর। এই একজনের কাছে চোখের জলসুদ্ধ ধরা পড়তে চাননি।

সুমিত্রা চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। সুমুও এই ফাঁকে মাকে দেখে নিচ্ছে।

সুমিত্রা স্নান সেরে এসেছেন। ভেজা চুল। ফর্সা মুখে ফোঁটা ফোঁটা জলের দাগ। আয়নার দিকে চলে গেলেন। ড্রয়ার খুলে চিরুনি বার করলেন।

পাঁচ মাস বাদে দেখা হবার পরে ঘরের তিনজনেই একেবারে চুপ মেরে গেলো অস্বস্তিতে। ছেলে একবার মাকে দেখে নিয়ে অনেকটা বেপরোয়ার মতো বলে ফেলল, তোমাকে প্রথমেই একটা সুখবর দিয়ে রাখি বাবা। এবার থেকে আমি তোমার সঙ্গে কন্ট্রাক্টরির কাজে লেগে যাবো। তোমার কাছে হাতেকলমে কাজ শিখবো।

এ-কথা শুনে রমেনবাবুই যেন ফাঁপরে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বললেন, না না, ও-সব তোকে করতে হবে না।

www.bengaliebook.com

সুমিত্রা মোটা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। অনেক চুল। সেই চুলে চিরুনি সুষ্ঠু হাত থেমে গেল। সামান্য মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকালেন।

রমেনবাবু ছেলেকে বললেন, মা যা বলবেন তাই করবি।

বা রে, মা-ই তো ওই কথা বলেছে তোমার সঙ্গে কাজ করব, তোমার কাছে। কাজ শিখব

রমেনবাবু আবারও হতচকিত একটু। এতো বিশ্বাস করতে হবে!

সুমিত্রার হাতে আবার চিরুনি চলছে। আয়নার দিকে মুখ। ছেলেকে বললেন, রঘুকে ওই চায়ের ট্রে নিয়ে যেতে বল, চা-জলখাবার সব একেবারে নিয়ে আসুক, গল্প করতে হয় মুখ হাত ধোওয়া হলে তারপর কর, সকাল নটা বেজে গেল–

পরোক্ষ শেষের উক্তিটা রমেনবাবুর উদ্দেশ্যে সেটা ছেলেও বুঝল। খাট ছেড়ে মায়ের নির্দেশ পালন করতে চলল সে।

সুমিত্রা ধীরেসুস্থে মাথা আঁচড়াচ্ছেন। অত চুলের জন্য শরীরের ওপরের দিকটা একটু বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। লোভীর মতোই দেখতে ইচ্ছে করছে রমেনবাবুর। আগে তাই দেখতেন। আয়নার ভিতর দিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এলেন। যেন তাড়া আছে এমনি ভাব করে মুখ হাত ধুতে চলে গেলেন।

হঠাৎ কি হল বা হতে পারে মাথায় ঢুকছে না। এই ছেলেকে অর্থাৎ সৌমেনকে নিয়েই মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সুমিত্রার সঙ্গে। এবারে কোর্টে নিষ্পত্তি হবার কথা। শ্বশুরের শেষ কড়া চিঠিতে এ-রকম আভাসই পেয়েছিলেন তিনি। আর গোঁ ধরে সেই অবাঞ্ছিত পরিণামের অপেক্ষাতে ছিলেন। তার মধ্যে ছেলে নিয়ে সুমিত্রা হঠাৎ ফিরে আসবে এ তিনি ভাববেন কি করে? শুধু তাই নয়, সুমু বাপের কাছে কাজ শিখবে, বাপের সঙ্গে কাজ করবে–সুমিত্রাই নাকি এ-কথা বলেছে! এ কানে শুনলেও সত্যিই বিশ্বাস করেন কি করে?

www.bengaliebook.com

তোয়ালেতে মুখ মুছে আবার ঘরে ফিরলেন রমেনবাবু। মাথা আঁচড়ানো শেষ করে সুমিত্রা মনযোগ দিয়ে কপালে সিঁদুরের লাল শিখা দিচ্ছে দেখলেন রমেনবাবু। রঘু চা আর সকালের খাবার রেখে গেছে। আয়নায় আবার চোখাচোখি হতে রমেনবাবু। মুখ ফিরিয়ে পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন।

-আগে টোস্ট আর পোচ খাও, তারপর চা ঢালবে।

আগে যে মেজাজে কথা বলত সুমিত্রা তার খুব একটা রকমফের হয়, নি। হাব ভাব-আহণও বদলায়নি। তবু এরই মধ্যে কোথায় যেন একটু ভিন্ন স্বাদ পাচ্ছেন। রমেন চেরী। টোস্ট আর ডিমের পোচ টেনে নিলেন। সুমিত্রা সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে রমেনবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। আজ অনেককাল বাদে টোস্ট আর পোচ থেকে হঠাৎ এই মুখখানা ঢের বেশী লোভনীয় লাগল তার। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে বেশী তাকাতেও পারছেন না।

-এই পাঁচ মাসে চেহারার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি!

সুতির গলায় একটু শ্লেষের আভাস আছে কি নেই ঠিক ধরতে পারলেন না। সহজ হর চেষ্টায় একটু হাসলেন রমেনবাবু।–কেন, খারাপ দেখছ?

রঘু বলল, সকালে তিন চার পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খেতে না। রাতেও দুটোর আগে ঘরের আলো নিভত না। শরীর খারাপ হবে না তো কি ভালো হবে?

রঘু ব্যাটা এইভাবে তাঁকে ডুবিয়েছে! কিন্তু চেষ্টা করওে তিনি রঘুর উপর রাগ করতে পারলেন না। পারলেন না, কারণ সুমিত্রার সেই চিরাচরিত কর্তৃত্ব আর ব্যক্তিত্বের ফাটল দিয়ে আজ তিনি ভিন্ন রকমের কিছু দেখতে পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন ছিলে?

–কেমন ছিলাম পাঁচ মাসের মধ্যে একটা চিঠি লিখে তো খবর নিতে পারতে? না কি ভেবেছিলে, দূর হয়েছে ভালই হয়েছে!

www.bengaliebook.com

জবাবে রমেন চৌধুরী বলতে পারতেন, তিনি চিঠি লেখার জন্যে প্রস্তুত হবার আগেই শশুর দুদুখানা কড়া চিঠি পেয়েছেন। একটাতে তার উপদেশ ছিল, নিজে এসে মেয়ের কাছে মাপ চেয়ে তাকে যেন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়। মাস দেড়েক প্রতীক্ষার পরে শ্বশুর দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি এবং সুমিত্রা দুজনেই ডিভোর্স সুট ফাইল করার কথা ভাবছেন। আশা করা হচ্ছে, এ নিয়ে সে (অর্থাৎ রমেন চৌধুরী) বেশী তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করবে না। এবং সৌমেনের ভবিষ্যতের যথাযথ ব্যবস্থাও তার বাবা বিনা জোরজুলুমেই করবেন।

এই দ্বিতীয় চিঠির জবাব রমেন চৌধুরী শশুরকে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, সৌমেন সাবালক, সে ইচ্ছে করলে তার বাবার কাছে থাকতে পারে, ইচ্ছে করলে মায়ের কাছে থাকতে পারে। আইনগতভাবে তার প্রতি আর কোন দায়িত্ব রমেনবাবুর নেই। তবে ছেলে যদি তার বাবার কাছে থাকা সাব্যস্ত করে, তার ভবিষ্যৎ-চিন্তাও তিনিই করবেন।

এ সব কথা মনে এলেও আজকের এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে তা বলা যায় না। টোস্ট চিবুতে চিবুতে সুমিত্রার মুখের দিকে চেয়ে একটু ঠাট্টাই করলেন রমেনবাবু। বললেন, এ-বয়সে স্ত্রী দূর হয়ে গেলে আর ভালোটা কি হতে পারে?

এইটুকুতেই সেই চিরাচরিত অসহিষ্ণুতা সুমিত্রার, থাক! পয়সার গরম হলে ষাট বছর বয়েসটাকেও তোমারা খুব একটা বয়েস ভাব না-বুঝলে?

রমেন চৌধুরী হাসছেন।–আমার ছেচল্লিশ...এটা কি তাহলে পুরো যৌবন?

সুমিত্রা চোখের কোণে মানুষটাকে আর একবার দেখে নিলেন। সকালে যখন পাখার হাওয়ায় কুঁকড়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছেন। নিরীহ– ঘুমন্ত মানুষটার দিকে চেয়ে তখনো একটা জোরের দিক আবিষ্কার করছিলেন তিনি। এখনো সেই জোরের দিকটাই দেখছেন। একটুও রাগ হচ্ছে না, বরং ভালো লাগছে। এই ভালো লাগার স্বাদটা আশ্চর্য রকমের নতুন। হঠাৎ হাসলেন সুমিত্রা একটু। বললেন, যাক শোন, সুমু ঠিকই বলেছে- এখন থেকে সে তোমার সঙ্গে কাজে বেরুবে।

শুনে রমেনবাবুই হাঁসফাস করে উঠলেন। সুমিত্রা ফিরেই যখন এসেছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আর ঘোঁট পাকাতে চান না। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, না-না, ও তুমি যা চাও তাই হবে। সুমু চার্টার্ড অ্যাকাউনটেনসিই পড়ক, দেখেশুনে ভালো একটা ফার্মে ভর্তি হয়ে যাক, তারপর টাকা খরচ করলে গাইড করার লোকও ঠিকই পাওয়া। যাবে।

সুমিত্রার চোখদুটো এমনিতেই বড়। মুখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকলে আরো বড় দেখায়। তেমনি চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। বললেন, কিন্তু আমি এখন আর তা চাই না–যা চাই তাই তোমাকে বললাম। কাল থেকেই ও তোমার সঙ্গে কাজে বেরুবে।

উঠে চলে গেলেন। রমেনবাবুর ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ। না, সুমিত্রার এ-রকম পরিবর্তনের জন্য তিনি কোনো ঠাকুর-দেবতার দোরে ধর্ণা দেননি। তবু এ কি করে সম্ভব হল ভেবে পাচ্ছেন না। সুমিত্রা যে রাগ করে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বাতিল করে এ-ভাবে ফিরে এসে আত্মসমর্পণ করল, রমেনবাবুর সেরকমও মনে হচ্ছে না। তার নিজের ইচ্ছেটাই সব। সে কোনরকম আপোসের ধার ধারে না।

অথচ এই সুমু আর সুমুর ভবিষ্যৎ নিয়েই পাঁচ মাস আগের সেই চরম ব্যাপার। অবশ্য এর আগেও স্বামী-স্ত্রীতে অনেক ঝগড়া হয়েছে আর সুমিত্রা রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। ঝগড়া বলতে যে গোছের বাকবিতণ্ডা বা বচসা বোঝায় তা নয়। সেভাবে কথা-কাটাকাটি করতে সুমিত্রার রুচিতে বাধে। আর রমেনবাবুও সবসময় কটকট করার মানুষ নন। যতক্ষণ সম্ভব সহ্য করেন, আর চুপচাপ দেখে যান বা শুনে যান। তারপর নিতান্ত অসহ্য হলে দুমদাম দু-পাঁচ কথা বলে বসেন। সুমিত্রা তখন এমনভাবে চেয়ে থাকেন যে তার সামনে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে না ইতরজন– তাই যেন সন্দেহ। তাই দেখে রমেনবাবুর মেজাজ এক-এক সময় দ্বিগুণ বিগড়োতো। তখন মাত্রাজ্ঞান ছাড়িয়েই যেত। ওরকম অশালীনতার একটাই জবাব, সুমিত্রার বাপের বাড়ি প্রস্থান। এরপর রমেনবাবু প্রথমে ছেলেকে পাঠাতেন, তারপরে টেলিফোনে। যোগাযোগের

www.bengaliebook.com

চেষ্টা করতেন। শেষে মুখ কাচুমাচু করে নিজেই শ্বশুরবাড়ির দিকে পা বাড়াতেন।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সর্বদাই তাঁদের মেয়ের পক্ষে। শাশুড়ী ঠারেঠোরে কিছু মন্তব্য করেন, শ্বশুর গম্ভীর মুখে দুই-একটা জ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন। বড়শালা বা শালার বউও দুই-একটা বিদ্রুপাত্মক কথা শোনাতে ছাড়েন না। তখনও ভিতরে ভিতরে ফুঁসতে থাকেন রমেনবাবু। কিন্তু তখন তার কানে তুলো, পিঠে কুলো। তবু নিজে গেলেই যে সুমিত্রাকে আনা যেত এমন নয়, তবে তাতে কাজ হত। রাগের মাত্রা অনুযায়ী একদিন বা দুদিন বা পাঁচদিন বাদে সুমিত্রা ফিরে আসতেন।

রমেনবাবুর মতো ঠাণ্ডা মানুষের হঠাৎ-হঠাৎ ধৈর্য্যের বাঁধ কেন ভাঙে সুমিত্রা সেটা কখনো বোঝেননি বা বুঝতে চেষ্টা করেননি। তার কারণ রমেন চৌধুরী মানে এক সাধারণ কনট্রাকটারের জীবনে তিনি দয়া করে পদার্পণ করেছেন এবং নিজের মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করে চলেছেন।

সুমিত্রার বাবা এক মস্ত এঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চার আনার মালিক। বড় অবস্থা। তেমনি চালচলন। আর রমেনবাবুর বাবা ছিলেন ওভারসিয়ার। নিজের উদ্যমে কনট্রাকটরি ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত মানুষ। সুমিত্রার বাবা তাকে পছন্দ করতেন। অনেক কাজও দিতেন। বি.এ পাশ করে রমেনবাবু আর চাকরির চেষ্টায় না গিয়ে বাপের ব্যবসায়ে লেগে গেছলেন, আর নিজের সততা আর পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যে তিনিও সুমিত্রার বাবার সুনজরে এসে গেছলেন। বছর দুই-আড়াইয়ের মধ্যে রমেনবাবুর বাবা মারা গেলেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, সুমিত্রার বাবা তখন ওই উদ্যোগী ছেলেটা অর্থাৎ রনেমবাবুর প্রতি একটু বেশী উদার হয়েছিলেন। কর্মঠ, বুদ্ধিমান ছেলে। কাছে ডেকে তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কাজও আগের থেকে আরও বেশীই দিয়েছেন ক্রমশ। আর তার ফলাফল দেখে খুশীই হয়েছেন।

www.bengaliebook.com

–রমেনবাবুর তখন পঁচিশ বছর বয়েস। একটা চাপা প্রলোভন দুর্বার হয়ে উঠল। কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে একেবারে মুখথুবড়ে পড়লেন। অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের একমাত্র মেয়ে সুমিত্রাকে একখানা চিঠি লিখে বসলেন। তার চার বছর আগে থেকে এ বাড়িতে আনাগোনা। ওই মেয়েকে অনেকবার দেখেছেন। খুব যে রূপসী তা নয়, সুখের ঘরে ওটুকু রূপ অনেক মেয়েরই থাকে। কিন্তু তাকে দেখে দেখে রমেন চৌধুরীর পাগল হওয়ার দাখিল। সুমিত্রার তখন সবে উনিশ। কলেজে পড়ছেন। তাঁর দাদা বিলেতে। সেখানে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। ভাবতে গেলে এই লোভ আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর সামিল। কোন যুক্তির দিকে না গিয়ে দীর্ঘদিনের একটা যন্ত্রণার অবসান করে দেবার সংকল্পে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

চিঠিতে চার বছরের স্বপ্ন আর সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কথাই লিখেছিলেন। আর লিখেছিলেন, যদি এতটুকু আশা পান তাহলে মৃত্যু পণ করেও তিনি সুমিত্রার যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করবেন।

স্বাস্থ্যবান সুঠাম এবং সুশ্রী লোকটাকে চোখের কোণ দিয়ে সুমিত্রাও বহুবারই দেখেছেন। ও-রকম করে দেখা আর নিজেকে যাচাই করারই বয়েস সেটা। কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্তই। বাবার আশ্রিতজনের প্রতি এতটুকু দুর্বল চিন্তার প্রশ্রয় ছিল না। তাই চিঠি পেয়ে সুমিত্রা প্রথমে স্তম্ভিত। এ দুঃসাহস ছাড়া আর কি? চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার ইচ্ছে। কিন্তু লোকটার মুখখানা মনে পড়তে তখনকার মতো ইচ্ছেটা বাতিল করলেন। কেন যেন একটা গুরুতর শাস্তি মাথায় চাপিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না। দরকার হলে ধৃষ্টতার জবাব নিজেই দিতে পারবেন। তাছাড়া বাবাকে যখন খুশী বলা যেতে পারে।

সেই বিকেলেই লোকটার দেখা পেলেন। তার খানিক আগেই বাবা বেরিয়েছেন। দূর থেকে তাকে দেখে সুমিত্রা ভুরু কোচকালেন। তারপর হনহন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন– কাকে দরকার? বাবাকে না আমাকে?

-উনি তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন দেখলাম। আমতা-আমতা জবাব।

ঘুরিয়ে বলা হল তাকেই দরকার।

www.bengaliebook.com

সুমিত্রার গলার স্বর এবারে ঝাঝালো।–চিঠির জবাব চাই?

–পেলে নিশ্চিন্ত হতাম।

-তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বাবা ফিরলে চিঠি তার হাতে যাবে। তিনিই জবাব দেবেন।

রমেন চৌধুরী চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। ভীত চাউনি নয়– বিমর্ষ বললেন, তাতে আর লাভ কি! চিঠি পড়ে তিনি গলাধাক্কা দেবেন, আর তুমি না চাইলে আমি বরাবরকার মতো চলে যাবো। তোমার কাছ থেকে এটুকু সম্মান অন্তত দুষ্প্রাপ্য ভাবি নি।

-তুমি! তোমার! সত্যিকারের ঝলসেই উঠেছিলেন সুমিত্রা।

বিব্রত মুখে রমেন চৌধুরী বলেছিলেন, খুব অন্যায় হয়েছে।... নিজের মনে তুমি তুমি করে চার বছর এত কথা বলেছি যে ওটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ওই মুখ দেখে কেন যেন সুমিত্রা সেরকম জোরের সঙ্গে রাগ। করে উঠতে পারেন নি। তবু তার গলায় ব্যঙ্গ ঝরেছে। নিজেও তুমি করেই বলেছেন।–তাহলে তুমি আশা করছ, জবাবটা আমিই দিয়ে তোমাকে একটু সম্মানিত করব!

-হ্যাঁ।

–আর জবাব পেলে তুমি নিজে থেকেই বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে!

–তা না গেলে নিজের আত্মসম্মানে লাগবে।

–আর সেই জবাবটা যদি অত হৃদয়বিদারক না হয়, তাহলে বাবার অনুগ্রহে থেকে আমার যোগ্য হতে চেষ্টা করবে! সুমিত্রার গলার স্বর একটুও নরম নয়।

www.bengaliebook.com

-তার অনুগ্রহ ছাড়াই চেষ্টা করব। রমেন চৌধুরীর শান্ত জবাব।

সুমিত্রার এবারে একটু মজাই লাগল।–বেশ, বাবার অনুগ্রহ ছাড়া যোগ্য হতে পারলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে কত বছর লাগবে?

-ভরসা পেলে দুবছরের বেশী লাগবে বলে মনে হয় না।...আমার বাবার একটা জমি কেনাই ছিল, দুবছরের মধ্যে সেখানে তোমার পছন্দমতো একটা বাড়ি তুলতে পারলে যোগ্যতার পরীক্ষায় তোমার যদি পাস-নম্বর দিতে আপত্তি না হয়, তাহলে গড়গড় করে আরো বড় পরীক্ষায় উতরে যাওয়া কঠিন হবে না।

প্রস্তাবে বৈচিত্র্য ছিল। মানুষটার জোরের দিক যাচাই করার লোভও হয়েছিল। সুমিত্রা কথা দিয়েছিলেন, দুবছর অপেক্ষা করবেন।

...শ্বশুরবাড়ির আদবকায়দার সঙ্গে কোনদিনও নিজেকে মেলানো সম্ভব হয়নি রমেন চৌধুরীর। এই রকম অসম বিয়েতে সুমিত্রার বাবা-মায়ের এবং বিলেত-ফেরৎ এঞ্জিনিয়র দাদার একটুও সায় ছিল না। কিন্তু আদবকায়দা ভুলে কালচারড মেয়ের সিদ্ধান্তও সরাসরি কেউ বাতিল করে দেননি। সুমিত্রা বিজয়ীর গলায় মালা যেমন দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বাপের বাড়ির আভিজাত্যের ছটাও তেমনি পুরেপুরি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। এদিক থেকে স্বামীটিকে উপযুক্ত করে তোলা যেন একটা বড় দায়িত্ব তার। গোড়ায় গোড়ায় মজাই পেতেন রমেনবাবু। পরে সন্তর্পণে শ্বশুরবাড়ির সংস্রব এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতেন। নিরলস প্রবল কর্মী পুরুষ তিনি, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির অন্য সকলের কথা বাদ দিয়ে সুমিত্রারও এজন্যে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে মনে হত না। সুমিত্রার যা কিছু পরামর্শ সব তার বাবা মা দাদার সঙ্গে।

রমেনবাবু সহজে কিছু বলতেন না! আর যদি কখনো কিছু বলেন, সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধরতেন–তুমি যা বোঝ না তা নিয়ে মাথা ঘামিও না।

এই থেকেই বিরোধের সূচনা ক্রমশ। বছর না ঘুরতেই কোলে ছেলে এলো, সুমিত্রার চোখে এও যেন মেহনতী মানুষের বিবেচনার অভাব। সাফ

www.bengaliebook.com

জানিয়ে দিয়েছেন, আর ছেলেপুলে নয়। এই লোকের প্রতি নির্ভর করতে না পেরে নিজেই তিনি সাবধান হয়েছেন। আর এই এক ছেলে সুমুও বড় হতে থাকল তাঁর মায়ের আর মামা-বাড়ির হেপাজতে থেকে। এ ব্যাপারেও রমেনবাবুর বক্তব্য বা বিবেচনা কেউ গায়ে মাখেন না।

কিন্তু ওপরওয়ালা শোধ নিচ্ছেন। ছেলেটা বাপের নেওটা, বাপের কাছে আসতে পেলে মা বা মামারবাড়ির দিকে ঘেঁষতে চায় না। দু-দুটো মাস্টার রাখা সত্ত্বেও স্কুলের পরীক্ষায় কোনদিন প্রথম দশজনের মধ্যেও তার নাম দেখা যায় না। মা শাসন করতে গেলে ছেলে বাপের কাছে পালায়। ওকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বেড়েই চলে। বাপ ছুটির দিনে বাগানের কাজে হাত দিলে ছেলে সোৎসাহে কোদাল দিয়ে মাটি কোপায়, জলনিকাশের নালা তৈরি করে। আর তাই দেখে মায়ের হাড়পিত্তি জ্বলে। সুমিত্রার মনের তলায় সব থেকে বড় আশঙ্কা, ছেলেটা বাপের মতো হয়ে। উঠছে। এই আশঙ্কা চাপাও থাকে না সব সময়। তখন স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া অনিবার্য।

এঞ্জিনিয়র দাদুর ইচ্ছে ছিল নাতি মস্ত ডাক্তার হোক। আর এঞ্জিনিয়র মামার ইচ্ছে ভাগনে বড় এঞ্জিনিয়রই হোক। কিন্তু দুদুটো বাছাই করা মাস্টার রাখা সত্ত্বেও সুমু সকলের আশায় ছাই দিয়ে হায়ারসেকেণ্ডারিতে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস করে বসল। এর ফলে সুমিত্রার যত রাগ গিয়ে পড়ল ছেলের বাপের ওপর। আর বাপ বলল যা হয়েছে হয়েছে, কত ছেলে তো থার্ড ডিভিসনে পাশ করে!

এই নিয়ে শেষে তুমুল বির্তক আর তারপর সুমিত্রার রাগ করে বাপেরবাড়ি প্রস্থান। ইদানীং এই রাগারাগি আর প্রস্থান একটু ঘন-ঘনই হচ্ছিল।

বাবা আর ভাইয়ের পরামর্শে সুমিত্রা এরপর ছেলেকে বি. এসসি অনার্স পড়ালো। উদ্দেশ্য, এতেও ভাল ফল হলে ডাক্তার অথবা এঞ্জিনিয়ার কিছু একটা হওয়া সম্ভব। অনেক টাকা মাইনে গুনে গোড়া থেকে দুজন প্রোফেসার রাখা হল। পড়াশোনার ব্যাপারে সুমিত্রা এবার ছেলের ওপরেও

www.bengaliebook.com

নির্মম। কিন্তু বি. এসসির ফল বেরুতে এবারেও সুমিত্রার মাথায় বজ্রাঘাত। ছেলে অনার্সই পায় নি, পাস কোর্সে পাস করেছে।

পাঁচ মাস আগের সেই মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটে গেল এই নিয়ে। দোষের মধ্যে হেসে হেসে রমেনবাবু বলেছিলেন, অনেক তো দেখলে, এবারে ছেলেটাকে রেহাই দিয়ে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে বেরোক, কাজকর্ম শিখুক–ভালোই করবে।

শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সুমিত্রা।–ওর ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেনি, তুমি কুলিমজুর ঠেঙাচ্ছো ঠেঙাও

রমেনবাবুও সশ্লেষে বলে উঠেছেন, আমাকেও তুমি একটু বড়গোছের কুলিমজুরই ভাবো জানি-আর-ঠিকই জানো, আমার ছেলে ওই কুলিমজুরের কাজটাই ভালো পারবে। আর তাতে লজ্জারও কিছু নেই, সেটা মগজে একটু বুদ্ধি থাকলে এত দিনে বুঝতে। তোমার বাবা আর দাদা শুনলাম এবারে সুমুকে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্সি পড়াতে বলেছে আর তুমিও তাই শুনে নাচছ–কিন্তু আমার কাছে শুনে রাখো তাতে ভস্মে ঘি ঢালা হবে–আর কিছু হবে না।

সুমিত্রার খরখরে দুচোখ তার মুখের ওপর স্থির খানিকক্ষণ।–অভদের মতো চেঁচিও না, সুমুর ব্যাপারে কেউ তোমার পরামর্শ চায়নি!

রমেনবাবু আরো উগ্র।–কেন কেউ চায় নি? কেন তুমি চাও নি?

-তোমার সে যোগ্যতা আছে ভাবি না।

–সেটা ভাবতে হলে নিজেরও কিছু যোগ্যতা থাকার দরকার। ভাববে কি করে, রক্ত-জল-করা টাকা মুঠো মুঠো খরচা করতে পেলে তোমার মতো কালচারের ছটা সকলেই দেখাতে পারে–বুঝলে?

রাগে মুখ সাদা সুমিত্রার।–আবার বলছি, ছোটলোকের মতো চেঁচিও না। এই কালচারের পিছনেই হাতজোড় করে ছুটেছিলে একদিন

www.bengaliebook.com

ছোটলোক শুনে মাথায় রক্ত উঠল রমেনবাবুর।–আমি সত্যিকারের গাধা বলেই এমন ভুল করেছিলাম, এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি!

খাটের বাজু ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন সুমিত্রা। এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছ?

–স্বামীকে ছোটলোক বলার পরেও বুঝতে পারা উচিত নয় ভাবছ?

–ঠিক আছে। বুঝতে যখন পেরেছ, আমার ব্যবস্থা আমি এখনো করব ছেলে সি. এ. পড়বে কি পড়বে না!

পড়বে না, পড়বে না। রমেনবাবু এতকালের সব আক্রোশ উজাড় করে দিতে চাইলেন।-আমার মতো ছোটলোকের ছেলে আমার মতোই ছোটলোক হবে। তোমার বাবা-মাকে গিয়ে বলো, তাদের ঘরের নাতি-নাতনীকে এক-একখানা করে হীরে-জহরত বানাতে–আমার ছেলের দিকে তাকাতে হবে না।

সুমিত্রা শেষবারের মতোই যেন দেখে নিলেন তাকে। তারপর বললেন, তোমার ছেলেও আর তাহলে তোমার ছেলে থাকবে না।

ছেলেকে নিয়ে সুমিত্রা বাপেরবাড়ি চলে গেলেন। সুমুর যাবার ইচ্ছে থাকুক আর না থাকুক, মার অবাধ্য হবার সাহস নেই। এবারে যাওয়াটা অন্যান্য বারের যাওয়ার মতো নয় রমেনবাবু সেটা অনুভব করেও চুপ একেবারে। তার গোঁ চেপে গেছে। শশুরের প্রথম চিঠি পেয়ে আরও তেঁতে উঠেছিলেন। মেয়ের কাছে তাকে মাপ চাইতে বলা হয়েছে! দ্বিতীয় চিঠিতে ডিভোর্সের হুমকি– সে চিঠির জবাব রমেনবাবু দিয়েছেন। আর তারপর থেকে শেষ ফয়েসলার জন্যেই প্রস্তুত হতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বুকের ভিতরটা খালি-খালি লাগে। তার ফলে নরম হবার বদলে নিজের ওপরেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি।

www.bengaliebook.com

পাঁচ মাস বাদে এই সকালে আচমকা পট পরিবর্তন। ছেলেকে নিয়ে সুমিত্রা নিজে থেকে ফিরে এসেছেন। শুধু তাই নয়, ছেলের প্রতি মায়ের নির্দেশ, এবার থেকে সে বাপের সঙ্গে বেরোবে, তার কাছে কাজ শিখবে।

.

রঘুর সঙ্গে সুমিত্রাও রান্নায় হাত লাগিয়েছেন আজ। সেই ফাঁকে সুমুকে আবার কাছে ডাকলেন রমেনবাবু। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার রে, তোর মায়ের হঠাৎ এরকম মত বদলালো কেন?

শুনে ছেলে প্রথমে হাসতে লাগল। তারপর বলল, মা আমাকে কিছু বলেন। নি, কিন্তু আমি জানি কেন বদলালো।

–কেন? রমেনবাবু আরো উদগ্রীব।

চাপা আনন্দে সুমু এবারে যে চিত্রটি তার সামনে তুলে ধরল, রমেনবাবুর মুখে আর কথা সরে না। দুকান ভরে শোনার মতোই বটে।

…মায়ের মেজাজ খারাপ, সুমুর দাদু তাই সক্কলকে নিয়ে মাদ্রাজে বেড়াতে গেছলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ধীরেসুস্থে ডিভোর্সের মামলার ব্যবস্থা করার কথা। সুমুর মামাও দাদুর দিকে।

…মাদ্রাজে মস্ত সফট ড্রিংক-এর রেস্তোরাঁ আছে। সকলে সেটাকে শেঠজীর ঠাণ্ডা ঘর বলে। বিরাট ব্যাপার। বড় বড় লোকেরা গাড়ি হাঁকিয়ে আসে সেখানে। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত জমজমাট ব্যাপার। দিশী বিলিতি যাবতীয় কোল্ড ড্রিংক এর বিশাল এয়ারকনডিশন রেস্তোরাঁ। কত বেয়ারা আর বয় খাটছে ঠিক নেই।

সুমুরা দল বেঁধে সেই কোল্ড ড্রিংক-এর রেস্তোরাঁয় তিন-চার দিন গেছে। ঠাণ্ডী ঘরের মালিক আধবয়েসী শেঠজীকে মারসিদিস গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু সুমুরা তার ওপর মনে মনে খুশী নয় তেমন। গদিতে বসে শ্যেনদৃষ্টি মেলে সকলের কাজের তৎপরতা দেখেন, খদ্দেরকে খুশী করার

www.bengaliebook.com

ব্যাপারে বয় বা বেয়ারাদের এতটুকু ত্রুটি দেখলে তাকে কাছে ডেকে চাপাগলায় বেশ করে ধমকে দেন।

এদের মধ্যে একটি বয় সকলের দৃষ্টি কেড়েছিল। বছর তের-চৌদ্দ বয়েস। ফুটফুটে গায়ের রং-ভারী মিষ্টি চেহারা। একমাথা কোঁকড়া চুল। ডাগর চোখ। ছেলেটা যেন সারাক্ষণ উৎসাহ আর উদ্দীপনায় ফুটছে। খদ্দের দেখলেই ছুটে যাচ্ছে, ছাপা মেনু কার্ড সামনে রেখে যাচ্ছে। খদ্দের জিজ্ঞাসা করলে কোন ড্রিংক-এর কি বৈশিষ্ট্য গড় গড় করে বলে যাচ্ছে। প্রথম দিন কি নেবে সুমুরা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বলে ছেলেটা মিষ্টি গলায় সুমিত্রাকে বলল, চকোলেট দেওয়া ক্রিম মিল্ক শেক সিন ম্যাডাম, আমি বলছি ভালো লাগবে!

চার্ট দেখে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, প্লেন পাইনঅ্যাপেল মিলক শেক-এর থেকে দাম বেশী কেন?

সোৎসাহে ছেলেটা বোঝালো কেন দাম বেশী। একটা ইলেকট্রিকে তৈরী হয়, অন্যটা হাতের কাজ। এতে রিস্ক বেশী, মেহনত বেশী। গড় গড় করে আরো কত কি বলে গেল ঠিক নেই।

সমস্ত রেস্তোরাঁয় ওই একটা ছেলে যেন ফুলের মতো মিষ্টি সৌরভ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সকলে তাকে ডাকে, সকলে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। ফলে ছেলেটার ছোটাছুটির বিরাম নেই। অমন সুন্দর ছেলেটা যেন এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছে।

সুমুর মামী আবার একটু-আধটু গল্প-টল্প লেখেন। তার ধারণা, বড় দুঃখের জীবন নিশ্চয় ছেলেটার। ভদ্রঘরের ছেলে যে তাতেও সন্দেহ নেই। অভাবের দায়ে হয়তো অসুস্থ বাপ-মা এই বয়সের এমন ছেলেকে এমন কাজে ঠেলে দিয়েছে।

সেদিন রাত সাড়ে দশটায় সুমুরা সকলে মিলে সেই ঠাণ্ডীঘরে গেছল।

www.bengaliebook.com

খদ্দেরের ভীড় তখন বেশ হালকা। এবারে দোকান বন্ধ হবার কথা। তাদের। দেখে সেই ছেলেটা ছুটে এল। এই কদিন তার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেছে। কিন্তু গল্প করার সময় ছেলেটা পায় না, ছেলেটা তখন দস্তুরমতো ক্লান্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম– তবু হাসি মুখ।

তাকে দেখে সুমিত্রার বাবা মা দাদা বৌদি সকলের মায়া হল। আর রাগ হল। দোকানের মালিক ওই শেঠজীর ওপর। দোকান বন্ধের আগে গদিতে বসে তখন কাড়ি কাড়ি টাকা গুনছে। এদের রক্ত-জল-করা পরিশ্রমের ষোল আনা ওই লোকটাই শুষে নিচ্ছে। এরা হয়তো দুবেলা ভালো করে খেতেও পায় না, আর ওই নিষ্ঠুর মালিক মারসিদিস হাঁকিয়ে বেড়াচ্ছে!

ছেলেটার নাম শঙ্কর। সেই রাতে সুমিত্রা তাকে এক গেলাস কোল্ড ড্রিংক খাওয়াতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু ছেলেটা একবার দূরের মালিকের দিকে চেয়ে হাসিমুখেই মাথা নাড়ল। অর্থাৎ এখন খাবে না। পাছে ছেলেটার কাজের ক্ষতি হয়, সেজন্য কেউ আর তাকে পীড়াপীড়ি করল না। কাজের ক্ষতি হলেই তো ওই অকরুণ মালিকের কাছে। বকনি খাবে। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, আজও তুমি সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় এসেছ?

–না, আমি পাঁচটায় আসি। আধ ঘন্টা আগে এসে সব দেখেশুনে নিতে হয়।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন, সকাল থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কি করো?

সকালে বাড়িতে পড়ি, তারপর স্কুলে যাই- তারপর বিকেলে খেয়েদেয়ে। দোকানে আসি।

–রোজ?

–রোজ।

সুমিত্রার বউদি জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়িতে তোমার কে আছেন?

–সবাই আছে।

www.bengaliebook.com

–বাবা-মা?

ছেলেটা মাথা নাড়ল। অর্থাৎ আছে। তারপর মিষ্টি হেসে বলল, আমার ভাইবোন দুটো ছোট তো, তাই মা আর দোকানে আসতে পারে না। তারপর সকলকে হতবাক করে দিয়ে অদূরে গদিতে বসা দোকানের মালিক শেঠজীকে দেখিয়ে বলল, ওই তো আমার বাবা, দোকান বন্ধ হলে বাবার সঙ্গেই আমি বাড়ি ফিরি। তারপর লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, বাবা বুড়ো হেয়ে গেলে আমাকেই তো এত বড় দোকানখানা চালাতে হবে, তাই রোজ বিকেলে বাবা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে আর সেই রাতে একেবারে দোকান বন্ধ করে একসঙ্গে বাড়ি যাই।...আমার খুব ভালো লাগে। আর বাবা যখন নিজে কড়া খদ্দের সেজে টেবিলে বসে আমাকে সার্ব করতে বলে আর গম্ভার মুখে মিথ্যে মিথ্যে দোষ বার করতে থাকে, তখন কি মজা লাগে না! আমার কিন্তু তখনো হাসার উপায় নেই, সত্যিকারের খদ্দেরের মতোই তাকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়।

সুমুর শেষ কথায় সম্বিত ফিরল যেন রমেনবাবুর। সুম বলছে, ছেলেটার সেই মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখে আর মিষ্টি কথা শুনে মায়ের মুখখানা যা হয়ে গেল না–তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না বাবা!

তারপর বাড়ি এসেই আমার ওপর ওই হুকুম। শুনে দাদু আর দিদা রাগ করলে, কিন্তু মা আর কোন কথায় কানও দিল না। তারপর আজ হাওড়া স্টেশানে পা দিয়েই আমাকে নিয়ে সোজা এখানে চলে এলো।

সুমিত্রা ঘরে ঢুকতেই ছেলে আর বাবা সচকিত। মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে সুমু যেন ধরাই পড়ে গেল। লজ্জা পেয়ে তক্ষুনি প্রস্থান করল।

রমেনবাবু সুমিত্রার দিকে চেয়ে আছেন। সুমিত্রা তার দিকে। ...বাইশ বছর বাদে দুজনে দুজনকে নতুন করে দেখছেন।

প্রশান্ত মিত্র দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে বসেছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে ইন্দিরা নিজে ওই চেয়ার পেতে তাকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। এখানে বসে ইচ্ছে করলে রাস্তার লোক-চলাচল দেখা যায়। ইচ্ছে করলে সামনের আকাশের খানিকটা দেখা যায়। ইচ্ছে করলে রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ি কটার জানলা দরজা বা বারান্দার মুখগুলো দেখা যায়। আর কিছুই হচ্ছে না করলে ইজিচেয়ারে মাথা রেখে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকা যায়।

বেরুবার আগে ইন্দিরা এই শেষের নির্দেশই দিয়ে গেছেন। কিছু চিন্তা করবে না, কিছু ভাববে না, মনটাকে একেবারে ফাঁকা করে দিয়ে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকবে, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে মার্কেটিং সেরে ফিরে আসছি–ঘরে কি আছে আর কি নেই কদিনের মধ্যে তো আর হুশ ছিল না–ছেলেমেয়ে দুটোরও যাদি বিবেচনা বলে কিছু থাকত-বাবার জন্যে কেবল চিন্তা করতেই ওস্তাদ তারা, ফাঁক পেলেই ছুটছাট বেরিয়ে পড়েছে–নিজে না বেরিয়ে করি কি! মহেশ কাছেই থাকবে, কিছু দরকার হলে ওকে বলো, আর খবরদার টেলিফোন এলে তুমি চেয়ার হেড়ে নড়বে না–মহেশ ধরবে, কেউ খোঁজ নিলে কি বলতে হবে ওর এতদিনে মুখস্থ হয়ে গেছে। ঠিক আছে?

প্রশান্ত মিত্র হেসে মাথা নাড়লেন, ঠিক আছে। বললেন, আমার চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে তুমি আবার গাড়ি-চাপা পড়ো না।

ইন্দিরা ব্যস্ত পায়ে চলে গেলেন। কিন্তু আধ মিনিটের মধ্যেই আবার ফিরলেন। হাতে একটা ছোট টুল। পায়ের সামনে ওটা পেতে দিয়ে বললেন, যখন ইচ্ছে হবে পা তুলে বোসো–আর ভালো কথা, আমি বেরুচ্ছি, এই ফাঁকে লুকিয়ে একটা সিগারেট খেলেও কিন্তু ধরা পড়ে যাবে–মহেশ ঠিক আমাকে বলে দেবে।

প্রশান্ত মিত্র মুখ টিপে হেসে বললেন, পি. এমএর আদেশ শিরোধার্য।

-আ-হা, পি. এমএর কথা কত শোনো তুমি! এ-কানে ঢুকলে ও-কান দিবে বেরোয়–শুনলে আর এই বিপাকে পড়তে হত না।

www.bengaliebook.com

চলে গেলেন। পি, এম অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টার। নামে মিল, তাই ইন্দিরা গান্ধ। যেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী সেই দিন থেকে ঘরের এই রসিকতা চাল। প্রশান্তবাবু সময়ে সময়ে এখনো ঠাট্টা করেন, ইন্দিরা সাম্রাজ্যের তবু একবার পতন হয়েছিল, মিত্র সাম্রাজ্যের পতন বলে কোনো কথা নেই। তাই পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো পর্যন্ত ওই নাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে।

গত চার সপ্তাহ ধরে বাড়ির বাতাসে চাপা উত্তেজনা থিতিয়ে ছিল। সম্ভাব্য শোকের উত্তেজনা। শোক ঠেকানোর উত্তেজনাও বলা যেতে পাবে। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রশান্তবাবুর বিবেচনায় একধরণের উত্তেজনা গোছেরই মনে হয়েছিল। হঠাৎ সত্যি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিনা নোটিসে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। বাঁ-কাঁধে আর বুকের বাঁদিকে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। বেজায় গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছিল। সমস্ত শরাবে যেন পিন ফোঁটানো হচ্ছিল। এ রোগ তিনি চেনেন। বাবা এই রোগে গেছেন। এক শালা গেল বছর এই রোগে গেছে। অন্তরঙ্গ এক খুড়তুতো ভাই ছমাস আগে গেছে। গত দেড় বছরের মধ্যে দুজন সতীর্থ অর্থাৎ প্রবীণ সাহিত্যিক আর একজন কবিবন্ধু এই রোগে চোখ বুজেছে।

তাই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডেকে তিনি কি হয়েছে বলেছেন। তারপর শুধু বলেছেন, মনে রেখো, যাই হোক কক্ষনো হাসপাতালে নয়।

তারপর আর কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু জ্ঞান পুরোমাত্রায় ছিল। দশ মিনিটের মধ্যে পাড়ার ডাক্তার এসেছে। আধঘণ্টার মধ্যে দুজন বড় ডাক্তার। যে লোকের নাম ডাক আছে তার বেলায় অন্তত তড়িঘড়ি বড় ডাক্তার কলকাতায় মেলে। পটাপট কটা ইনজেকশান দেওয়া হল প্রশান্তবাবু টের পেয়েছেন। তারপর দুটো দিন ঘুম আর ঘুমের ঘোরে কেটেছে।

তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পর থেকে চিকিৎসার আড়ম্বর আর সেই সঙ্গে এই চাপা উত্তেজনা দেখে যাচ্ছেন। দুদিনের সমাচারও শুনেছেন। দুজন বড় ডাক্তারই রোগীকে তক্ষুনি হাসপাতালে সরাতে চেয়েছিল। ইন্দিরা বেঁকে বসতে তা হয়নি। দুজন ডাক্তারই দস্তুরমতো অসন্তুষ্ট তাতে। তারা

ছেলেমেয়েকে ডেকে বলেছে, এ অবস্থায় পেশেন্টকে বাড়িতে রাখা নির্বোধের কাজ হবে। ছেলেমেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। ইন্দিরার এক কথা, চিকিৎসা বাড়িতেই হবে–তার জন্যে দশগুণ খরচ হয় হোক-হাসপাতালে নয়।

হাসপাতালে কেন নয় ছেলেমেয়েও মোটামুটি আঁচ করতে পারে। না থেকে শুরু করে আত্মীয়-পরিজন আর বাবার বন্ধুদের এই রোগে যে কজনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের একজনও জীবিত অবস্থায় ফেরেনি। বাবা খোলাখুলি বলতেন, যাবার সময় হলে কোনো পাতাল থেকেই কেউ ফিরবে না–আর কিছু হলে কেউ হাসপাতালে নেবার নামও করবি না।

প্রশান্তবাবু নিজেও জানতেন হাসপাতাল সম্পর্কে এরকম একটা ধারণা থাকা কোনো শিক্ষিত মানুষের উচিত নয়। এমন অনেক রোগ আছে যার যথাযথ চিকিৎসা আর আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা শুধু হাসপাতালেই হতে পারে। কিন্তু হাসপাতাল নামটই তাঁর ব্যক্তিগত অ্যালার্জির মতো। ইন্দিরারও ভয়, জ্ঞান হবার পর স্বামটি যদি দেখেন হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে আছেন, তক্ষুনি আবার অঘটন ঘটে যেতে পারে।

যাই হোক, প্রশান্ত মিত্র বাড়ির শয্যাতেই ফাড়াকাটিয়ে উঠলেন। ফতা কাটিয়ে উঠেছেন এ ধারণা শুধু তার নিজের-বাড়িতে আর একজনেরও না। তার ওপর বড় ডাক্তাররা নাকি বলে গেছেন, আরো কিছুদিন না গেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এই আরো কিছুদিনটা কত দিন তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রশান্তবাবুর।

দুশ্চিন্তা নিজের শারীরিক দিক ভেবে নয়, চিকিৎসার আড়ম্বর, স্ত্রী ছেলেমেয়ে আর খুব ঘনিষ্ঠ দুচারজনের গার্জেনগিরির দাপটে। ডাক্তাররা সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করলেও আর চলাফেরা কাজকর্মের স্বাধীনতা দিলেও এরা তা মানবে কিনা সন্দেহ। একটু অনিয়ম করা হয়েছে মনে হলে ইন্দিরা স্নেহমাখা ধমকের সুরে কথা বলেন, ছেলে সুশান্ত আর মেয়ে অনীতা সোজাসুজি ধমকায়, বলে, আর তোমার কথামতো কোনো কিছু চলবে না

www.bengaliebook.com

জেনে রাখো। আর খুব ঘনিষ্ঠরা খবর নিতে এলে ছেলেমেয়ে তাদের কাছে নালিশ জানায়, এই এই অনিয়ম করা হচ্ছিল বা হতে যাচ্ছিল। শুনে তারাও শুভার্থীর মতো হিতোপদেশ দিয়ে যায়।

ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত মাইলড করোনারি অ্যাটাক। কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেয়েদের দুশ্চিন্তার কারণে আর প্রচারণে রোগীর অবস্থা সকলের কাছেই সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। রেডিও থেকে ফোনে বাড়ির লোকের মুখেই খবর নেওয়া হয়েছে। তারা জেনেছে। অবস্থা সংকটজনক–এবং সেই প্রচারই করেছে। খবরের কাজগুলোতেও একইভাবে এই সংকটজনক অবস্থার খবরই ছড়িয়েছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলে কোনো কোনো কাগজের প্রতিনিধি এও লিখেছে, মনস্তাত্ত্বিক চবিত্রচিত্রনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক প্রশান্ত মিত্রর নিষেধেই তাকে হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে সরানো সম্ভব হয়নি। শেষের সময় যদি উপস্থিত হয়েই থাকে, তিনি স্বগৃহেই তার জন্য প্রস্তুত। পরে অপ্রত হেলে অবশ্য সরোষে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করেছে, কাগজগুলো মিথ্যেবাদী, আমি কখনো এরকম কথা বলিনি।

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই জবাব দিয়েছেন, বলে থাকলেও তো সত্যি কথাই বলেছিস, তোর রাগ হবার কি হল।

এমন প্রচারের যা ফল, তার উত্তেজনা ঠাণ্ডা হতে সময় একটু লাগবেই। প্রথম দিনকতক তো বাড়ির সামনেই কত চেনা অচেনা মেয়েপুরুষের ভিড়। অবস্থা জানানোর জন্য সুশান্তর দুই বন্ধুকে নিচের দরজায় মোতায়েন রাখতে হয়েছে। এদিকে মুহুর্মুহু টেলিফোন। প্রশান্তবাবুর লেখার ঘর থেকে টেলিফোন অবশ্য সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। কারণ শোবার ঘরের পরেই লেখার ঘর। তবু ফোন এলে এ ঘর থেকেও রিং শোনা যায়। ফোনে খবর জানানোর দায়িত্ব অনীতার অথবা ইন্দিরার। তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটটা করে ফোন আসার খবর প্রশান্তবাবু পেয়েছেন। ফোনে কারা কারা খবর নিচ্ছে নোট রাখা উচিত এবং এই উচিত কাজে গাফিলতি হয়নি। সমবয়সী আর অনুজ লেখক, পাবলিশার, ছোট বড় মাসিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, সিনেমার পরিচালক প্রযোজক, প্রশান্তবাবুর। স্নেহভাজন অভিনেতা অভিনেত্রী

www.bengaliebook.com

গায়ক গায়িকারা সকলেই বাড়িতে এসে খবর নেবার কর্তব্য পালন করে চলেছে। রোগীর সঙ্গে দেখা করা নিষেধ। ফলে তাদের রোগীর খবর জানানোর দায়িত্ব ইন্দিরার বা ছেলেমেয়ের। প্রত্যহ কারা কারা খবর নিতে এলো। ইন্দিরা সন্ধ্যার পর সময় বুঝে স্বামীকে বলেন।

এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রশান্ত মিত্র হাল ছেড়ে আসমর্পণ করা ছাড়া আর কি করতে পারেন? প্রচুর সিগারেট খেতেন। পনের দিনের মাথায় ডাক্তার তিনটে পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। এ সপ্তাহ থেকে পাঁচটা। তাতেও ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ের। বেজায় আপত্তি। একটু আধটু ড্রিংক করা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছল। ডাক্তারের মতে এ রোগে সিগারেটের থেকে ড্রিংক কম ক্ষতিকর–আরো কিছু দিন গেলে একটু আধটু খাওয়া চলতে পারে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ে ওই ডাক্তারের ওপর রেগে আগুন। তাদের ধারণা, ডাক্তার নিজে খায় বলেই অমন উদার। ছেলে তার এক বন্ধুর ডাক্তার বাবার সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে এসে ঘোষণা করল, এই ডাক্তার আর চলবে না, বাবার মুখ চেয়ে ফতোয়া দেয়, আমি খুব ভালো করে জেনে এসেছি ড্রিংক সিগারেট কোনোটাই একদম চলা উচিত নয়।

মেয়ে আর মায়ের কাছে এই ফতোয়াই অভ্রান্ত। প্রশান্তবাবু মনে মনে বিরক্ত। বাপের পয়সায় ছেলে দিনের মধ্যে কপ্যাকেট সিগারেট ওড়ায় ঠিক নেই–লুকিয়ে চুরিয়ে ড্রিংকও একটু আধটু চলে কিনা সে সম্পর্কেও একেবারে নিঃসংশয় নন। কিন্তু মুখে তিনি বাদ প্রতিবাদ কিছু করেন না। এখন বে-কায়দায় পড়েছেন–সময় হলে নিজের যা করার করেই যাবেন এ ওরাও ভালো করেই জানে। জানে বলেই এত কড়া নজরে এখন।

কাঠের টুলে দুপা তুলে দিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে গা ছেড়েই শুয়েছিলেন প্রশান্ত মিত্র। মাথার মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল। হিজিবিজি ব্যাপার বলতে কতকগুলো এলোমোলো চিন্তা। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই, এমন সব আধা ঘুমের মধ্যে যেমন অজস্র ছাড়া-ছাড়া চিত্র ভেসে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি কাউকে বলেন নি, একেবারে ছেলেবেলা থেকে এ-রকমটা হয়ে আসছে।

www.bengaliebook.com

একশ বিক্ষিপ্ত চিন্তার মিছিল মগজের মধ্যে যেন মুর্তি ধরে সার বেঁধে চলতে থাকে। মনষের চরিত্র বিস্তারে সিদ্ধহস্ত শিল্পী তিনি। যে চরিত্র কলমের ডগায় অবয়ব ধরে, তার ভেতর-বার পাঠককে আয়নায় দেখিয়ে দিতে পারেন। অতিবড় রূঢ় সমালোচকও চরিত্র বিশ্লেষণে প্রশান্ত মিত্রর মুক্তি নেই ভাবেন। অনেক সময়েই তারা লেখেন, ফের চরিত্রের গভীরতম অন্তঃপুরে অনায়াসে ঢুকে পড়ার যাদুকাঠিটি এই এক লেখকের হাতের মুঠোয়। আর তারই মগজের মধ্যে এমন এমন এলোমেলো হিজিবিজি ন্তির মিছিল সার বেঁধে চলতে থাকে এ নিজের কাছেই বরাবর একটা কৌতুকের ব্যাপার!

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন প্রশান্তবাবু। মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওই এলোমেলে, অথচ জীবন্ত চিন্তার মিছিলকে যদি কাগজে কলমে ধরে রাখা যায় তো কি দাঁড়ায়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মহেশকে ডেকে হুকুম করলেন, আমার কালো নোটবই অর পেনটা দিয়ে যা–

মহেশ দ্বিধান্বিত। মনিব এটা উচিত কাজ করছেন না, আর মা শুনলে বকবেন এ সে-ও জানে।

কি বললাম কানে গেল?

মেজাজের আভাস পেয়ে মহেশ ঘর থেকে মস্ত কালো নোটবই আর কলম রেখে গেল। এ নেটবইটা বাড়ির সকলেরই খুব চেনা, কিন্তু কেউ আর এখন এটা খোলে না। লেখার কোনো প্ল্যান বা প্লট মাথায় এলে এতে লিখে রাখেন। কিন্তু নোট করার পদ্ধতি এন বিচিত্রি যে দেখে বা পড়ে কারোই তেমন বোধগম্য হবে না। জ্যামিতিক নক্সার মতো মনে হবে। তার মধ্যে দুচারটে নাম, দুচার অক্ষরে একটা-দুটো ঘটনা, তার মধ্যে অ্যারো টেনে কোথাও সার্কেল কোথাও ট্রায়েঙ্গেল কোথাও বা রেকট্যানে তিনশ পাতার লম্বা বাঁধানো এই নোটবইয়ের প্রায় দুশ পাতা এই গোছের প্লটের নক্সায় বোঝাই। আর তার প্রায় সবগুলোতেই লাল দাগ, মারা। অর্থাৎ যে প্লট বা প্ল্যানগুলো নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে তাতে ওই লাল দাগ পড়ে। ইন্দিরা

www.bengaliebook.com

আর ছেলেমেয়েও তার এই প্ল্যান অথবা প্লটের বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় না বলে কৌতূহল গেছে।

নোটবইটা খুলে হোট টুলের ওপর রেখে আজ আর কোনো প্লটের হক কাটতে বসলেন না প্রশান্ত মিত্র! ওই চিন্তার এলেমেলো মিছিল যেমন আসে তেমনি সাজানোর সংকল্প। ...খুব ছেলেবেলা থেকেই ধরা যেতে পারে। চোখ বুজলে সেই নবছরে ছেলেটাকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। তার উদ্ভট চিন্তার কারিকুরিও।

...ইস্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না। অঙ্কের মাস্টারটা বেত নিয়ে ক্লাস ঢোকে। অঙ্ক ভুল হলে শপাশপ মারে। হি-হি-হি-হি-ওই মাস্টারের পিতেই বৃষ্টির মতো বেতের ঘা পড়ছে। যন্ত্রণায় মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। হি-হি-হি-কিছু দেখতে পাচ্ছে না বুঝতেও পারছে না। অদৃশ্য মানুষ হয়ে কে মারছে জানবে কি করে?..-টা যাচ্ছে তাই। অতবড় পাটালি থেকে এক ডেলা মাত্র ভেঙে দিল। কি দারুণ খেতে। বেশ খেলে পেট কামড়াবে না হাতি। বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। এর প্রাণের সাধে পাটালি খেতে হবে। ওই ঘাড় গোঁজা ধ্যাবড়া মোটা জলের কল। বিচ্ছিবি। ভূতেরা নিশ্চয় ওই রকম দেখতে। ও-মা! তীবের মতে সাইকেলটা যে গায়ের ও এসে পড়ছে। দাঁড়াব? হুটব? দাঁড়াব? দাঁড়াব? না ছুটি। গেল গেল গেল! সব অন্ধকার। দারুণ যন্ত্রণা। মাটি থেকে কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। অন্ধকার এক কমছে। দাওয়ায় আঠের-উনিশ বছরের যে মেয়েটা সে-ই বুকের সঙ্গে পেটে নিয়ে ছুটে বাড়িতে ঢুকছে। তার বুকটা কি নরম আর কেমন অদ্ভুত লাগছে। হি-হি-হি হি। এ-মা ব্যাটাছেলে সাইকেল চাপা পড়ে। পাশের বাড়ির খুটা ছুটে ভিতরে পালিয়ে গেল। ধরা গেল না। হাত পা গা মুখের ছাল উঠে একাকার আর ওই মেয়ের হাসি ধরতে পারলে মজা বুঝবে। ...আচ্ছা, ওই যে মেয়েটা বুকে জাপটে তুলে নিয়ে গেছল, খুকুটা বড় হলে তার মতো হবে? ওরও ওই রকম বুক হবে? মা মাসি খুড়ি জেঠ নয়, তাদের থেকে ঢেব কমবয়সী মেয়েদের সক্কলের মধ্যে কিছু একটা মজা লুকিয়ে আছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে। বুঝতে ইচ্ছে করে। খুকুটা বেজায় ছোট। তবু ওকেই একদিন ধরে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আর টিপেটুপে দেখতে হবে ...।

www.bengaliebook.com

প্রশান্তবাবু কলম রাখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হানি। একটা আস্ত না হোক আধখানা সিগারেট খেলে ভালো লাগত। থাকগে। ইন্দিরা চেঁচামেচি করবে। এই কড়াকড়ি কদিন আব চলবে। পাঁচ সাত মিনিট ইজিচেয়ারে মাথা রেখে পড়ে রইলেন। এবারে ঠোঁটের ফাঁকে আগের থেকে একটু বেশি হাসি। সোজা হলেন। নোটবইয়ের পাতা উল্টে কলম নিয়ে আবার ঝুঁকে বসলেন।

...মফঃস্বলের কলেজ নয় তো যেন স্কুল! এক ঘর ছেলে আর সাত-সাতটা মেয়ের চোখের ওপর নাম ধরে দাঁড় করিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করা। আগের দিন কোলরিজের রাইন অফ দি এনসেন্ট মেরিনার শেষ করে আজই আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর ইয়ারো আনভিজিটেড ইয়ারো ভিজিটেড ধরে এতটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকে কাল মন যখন ছিলই না, চুপ করে না থেকে বোকার মতো কেন জবাব দিতে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কাব্য-প্রকৃতির প্রশ্নের জবাবে কোলরিজের কাব্য-প্রকৃতি দিয়ে উত্তর শুরু করলে ক্লাসসুদ্ধ সক্কলে হেসে উঠবে না তো কি? অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেই যে ওই তাঁদর প্রেফেসার এই একজনকেই ধরেছে তাতে কোন ভুল নেই। সক্কলের সঙ্গে মেয়েদের আলাদা বেঞ্চ থেকে গায়ত্রীও নাস্তানাবুদ মুখখানার দিকে চেয়ে কম হাসছিল না–এটাই বেশি যন্তন্নার মতো। বয়সে দুতিন মাসের বড় আর দিদির সঙ্গে ভাব বলে গায়ত্রীরও কথাবার্তায় দিদি-দিদি ভাব। বিকেলে বাড়ি এসে কিনা বলল, এই হাঁদারাম, ক্লাসে তোমার মনটা থাকে কোথায়?...ফস করে যদি মুখের ওপর বলে বসতে পারত কোথায় থাকে? ক্লাসে বসে আয়েস করে এই গায়ত্রীর মুখখানাই তো দেখছিল।...শুধু মুখখানা? কত কিছু দেখার মধ্যে ডুবে গেলে ক্লাসে অমন ভুলের মাশুল দিতে হয়?...রং একটু কালো হলেও এই সুঠাম ঢলেশ্বরীর পাশে অন্য মেয়েগুলো সব পাকাটি।...হকির নক আউট ফাইনালে নিজের দোষেই কলেজ টিমের হার হয়ে গেল। দুদুটো সোজা গোল মিস করে বসল। বিজয়ীর কাপ হাতে গায়ত্রীকে শৌর্যের মূর্তিখানা দেখানো গেল না। ..কলেজ ম্যাগাজিনে গল্পটা ছাপা হয়েছে আর গায়ত্রীও সেটা পড়েছে নিশ্চয়। নইলে বারো গজ দূরে মেয়েদের আলাদা জায়গায় বসে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল কেন? সুলতা সিংহ আর

www.bengaliebook.com

রঞ্জিতা বোস ক্লাস শেষ হতে বলেই গেল, জিত গল্পটা দারুণ হয়েছে। না, প্রেম বা বিয়ের গপপ নয়, একটি খুব সাধারণ ছেলে শুধু হৃদয়ের আশ্চর্য প্রসাদগুণে কেমন করে এক অহংকারী মেয়ের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠল– সেই গল্প। বিকেলে গায়ত্রী বাড়ি এলো। ওর সামনেই হেসে হেসে দিদিকে বলল, তোমার ভাই এঁচড়ে পেকে গেছে রমাদি, মেয়ে কাকে বলে জানে না, মেয়ে নিয়ে গপপ লেখা শুরু করেছে। ...ক্লাসে গায়ত্রীর সেই চাউনি আর টিপটিপ হাসি দেখেই ভিতরটা কেমন গরম গরম লাগছিল। এই কথা আর এই হাসির পর একটা উষ্ণ বাষ্প ভেতরে কেঁদোচ্ছে। রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওই কথা আর এই হাসি একটা স্পর্শ হয়ে এক অব্যক্ত যন্তন্নার আগল ভেঙে চলেছে। কত জানে গায়ত্রী যদি জানত। বুক আর দুটো হাতের চাপে পাশবালিশটার দফা প্রায় রফা। কিন্তু এটা কি পাশবালিশ নাকি?..রাত দুটো। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ক্লাবের ওরা চুপিসাড়ে এসে জানলায় একবার টর্চ ফেলবে। ফেলল। বালিশের তলা থেকে নিজের টর্চ বার করে একবার জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পাঁচিল টপকে রাস্তায়। ভূতুড়ে অন্ধকারে সকলে। মিলে সোজা আড্ডা-বাগানে। গা ছমছম করছে। গোটা বাগানটাই কোনো এক কালের কবরে ছাওয়া। নিজেদেরই পায়ের খসখস শব্দ, অথচ মনে হচ্ছে অশরীরীরা যেন আপত্তি জানাচ্ছে। ছেলেবেলার সেই ঘাড়-গোজা থ্যাবড়া মোটা কলের মতো ভূতগুলো অন্ধকারের শরীর ধরে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। ধ্যেৎ। এতগুলো জোয়ান ছেলে। একসঙ্গে, ভূতের নিকুচি করেছে। একজন টর্চের আলো ফেলতে সামনেই ওই মস্ত লম্বা লোহার বামটা দেখা গেল। মণ পনের ওজন হবে ভেবেছিল। আঠেরো জনে মিলে হিমসিম খেয়ে ওটা কাঁধে তুলতে মনে হল বিশ মণের কম হবে না। আধমাইল পথ ভেঙে রাতের অন্ধকারে লোহার বামটা ক্লাবঘরের পিছনে এনে ফেলতে সকলের কালঘাম ছোটার দাখিল। কাজ সেরে আবার যে-যার বাড়ি। বিছানা। কালই ওই লোহার বীমটা ঠেলায় করে গণেশ সাহার দোকনে চলে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন ঘরের দোরে। লোহালক্কড়ের আগুন দাম। পনের ষোল মণ ওজন ধরেই গণেশ সাহা অনেক টাকা কবুল করেছে। সেই টাকায় ক্লাবের ব্যায়ামের সরঞ্জাম আসবে। নিজর সেই স্বাস্থ্যশ্রী বিছানায় শুয়ে চোখ চেয়েই কল্পনা করতে পারছে। দেখতে পাচ্ছে।

www.bengaliebook.com

গায়ত্রও তার মুগ্ধ চোখে পলক পড়ে না। আঃ, কেলো হারামজাদা আজ আবার পাশবালিশটা দিতে ভুলেছে। কাল ওর মাথাটা ভাঙবে। টর্চ জ্বেলে পাশবালিশটা নিয়ে আসতে হল। তারপর ওই মেয়ের আর কত তফাতে থাকবে সাধ্যি?...কত রোগের কত ওষুধ বেরুচ্ছে, টাইফয়েডের ওষুধ এখনো নেই কেন? এখন পর্যন্ত কেবল কাজ ভরসা আর সেবা ভরসা কেন? তাহলেও এই সেবাটুকুর ভার কেবল একজন পেলেই গায়ত্রী ম্যাজিকের মতো সেরে উঠতে পারে। কল্পনায় সেবার ভার নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছে গায়ত্রী সেরে উঠছে।...এ কি হল! এনসেন্ট মেরিনারের নাবিকরা পাপ করেছে। তাদের সামনে। মঙ্গলের দূত গুলিবিদ্ধ বিশাল অ্যালবেট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায়। দুর্যোগে নাবিকেরা সব পাগল। তারা হিংসা ভুলে আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকহে। শান্তির অনুভূতি ফিরে আসছে।... কবরের শান্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ অশরীরীরা সব মশারির বাইরে অন্ধকারে ঘুরঘুর করছে। তারা প্রতিশোধ নেবে।...একজনের লাভের পাপ, বাসনার পাপ গায়ত্রীকে স্পর্শ করেছে। গায়ত্রী চরম প্রতিশোধ নিল। গায়ত্রী শ্মশানের আগুনে নিজেকে শুচিশুদ্ধ করে নিল। আরামের শয্যায় শুয়ে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে এই একজনের। ওই নাবিকদের মতো আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে চেষ্টা করছে। মা–মাগো! ভোররাতে দুচোখে ঘুম নামল। মনে হল বালিশে নয়, মায়ের কোলে শুয়ে আছি।... ... ...

নোটবই আর কলম বন্ধ করে প্রশান্তবাবু আবার ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। ভিতরটা বেশ হালকা লাগছে। আরো মিনিট দশেক বাদে ইন্দিরা ফিরলেন। টুলে নোটবই আর কলম দেখে আঁতকে উঠলেন।–এইজন্যেই তো আমি বেরুতে চাই না, এরই মধ্যে নোটবই আর কলম নিয়ে তুমি লেখার ছক কাটতে বসে গেলে? ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা ঝাঝালো গলায় ডেকে উঠলেন, মহেশ!

সন্ত্রস্ত মহেশ তক্ষুনি হাজির। ইন্দিরা কিছু বলার আগেই প্রশান্তবাবু আদেশ দিলেন, দরকার নেই, যা—

www.bengaliebook.com

মহেশ সরে যেতে হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মহেশও আমার ওপরে। গার্জেনগিরি করতে পারেনি কেন সেই কৈফিয়ত তলব করতে যাচ্ছিলেন?

ইন্দিরা মনে মনে অপ্রস্তুত একটু। ফলে জবাবের ঝাঁঝ আরো বেশি। তুমিই বা এমন অবুঝপনা করবে কেন–এখন তোমার লেখার প্লট ঠিক করার সময়?

কালো নোটবই মানেই লেখার প্লটের নক্সা বা খসড়া ভাবেন। জবাব না দিয়ে প্রশান্ত মিত্র গম্ভীর মুখে চেয়ার চেড়ে উঠলেন। ডাকলেন, এসো

ফোনটা যে ঘরে সরানো হয়েছে সেই ঘরে চললেন। ইন্দিরা পিছনে। দ্রুত এগিয়ে হাত ধরতে পারলেন না। হঠাৎ কি হল ভেবে পেলেন না। স্বামীর এই গোছের গাম্ভীর্যকে একটু সমীহ করেন।

ঘরে ঢুকে প্রশান্তবাবু ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। ডায়েল করলেন। ইন্দিরা এখনো কিছু না বুঝে চেয়ে আছেন। একটু বাদেই স্বামীর কথা থেকে বুঝলেন, কাকে ফোন করা হল এবং লাইনের ও-ধারে কে। হার্ট স্পেশালিস্ট, যিনি গত একমাসের মধ্যে অনেক দিন বাড়ি এসে রোগী দেখে গেছেন।

সাড়া পেয়েই প্রশান্তবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর আমার বিরুদ্ধে ভীষণ নালিশ আছে।...এঁর মুখেই শুনে আপনার যা বলার ওঁকে বলুন আমার মনে হচ্ছে। একাসেরও পরে এমন কড়াকড়ি চললে আবার আমাকে বিছানা নিতে হবে।

রিসিভারটা ইন্দিরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তার বিড়ম্বিত মুখখানা মিষ্টি লাগছে। অপেক্ষা না করে গম্ভীর মুখেই প্রশান্তবাবু ঘর থেকে নিজের শোবার ঘরে চলে এলেন।

মিনিট পাঁচেক বাদে ইন্দিরা এলেন। অনুযোগের সুরে বললেন, তুমি ডাক্তারকে ঘুষ খাইয়ে রেখেছিলে নাকি?

প্রশান্তবাবু শব্দ করেই হেসে উঠলেন। নালিশের জবাবে পেশালিস্ট ডাক্তার কি বলে থাকতে পারেন এই থেকেই বোঝা গেল।

www.bengaliebook.com

ইন্দিরা এবারে উৎসুক একটু।–তা এতবড় অসুখ থেকে উঠেই হঠাৎ কি? মা এল তোমার?

ভিতরে ভিতরে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলেও প্রশান্তবাবু নির্লিপ্ত জবাব নিজে নোটবইটা খুলে নিজেই দেখো কি প্লট।

পাছে সত্যি ওটা খোলে সেই জন্যেই বলা কাজ হল। ইন্দিরা বললেন, আ-হ, তোমার ওই নক্সা আর আঁকিবুকি দেখে কি বুঝব। শুনিই না কি প্লট, এই এ নিয়ে কিছু না তো?

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। এ-সব কিছু না।

পরদিন। বিকেলে আগের দিনের মতোই প্রশান্তবাবু বারান্দার ইজিচেয়ারে বসেহন। কাঠের টুলের ওপর নোটবই কম। ইন্দিরা আজ এ নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেননি। বড় ডাক্তার কাল বলেছেন, একটু একটু করে নিজের কাজের মধ্যে ফিরে আসতে চাওয়াটাই সব থেকে সুস্থতার লক্ষণ। পাশের মোড়ায় বসে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন। তারপর স্বামীর বিমনা ভাব লক্ষ্য করে উঠে গেছেন। নতুন কিছু সৃষ্টির আগের এই তন্ময়তা খুব ভালো চেনেন।

প্রশান্ত মিত্র সত্যিই বিমনা আর তন্ময় হয়ে পড়েছেন কোনো সৃষ্টির তাগিদে ন গজের মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। চিন্তার এলোমেলো মিহি সচল অবাক ছবির মতো সার বেঁধে চলেছে। তারই ভিতর থেকে চোখের সামনে একখানা মুখ ধরে রাখার চেষ্টা। তারই ভিতরের আর একখানা মুখ।

খুব স্পষ্ট করে ধরা গেল। প্রশান্তবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির টুকরো। নোটবই খুলে কলম নিয়ে কুঁকলেন।

…তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে গেল। কাটুক। গলাটাই কাটতে ইচ্ছে করছে। নাকেমুখে গুঁজে এক্ষনি দশটা-পাঁচটার অফিসে ছোটো। চাকরি না। তো ফাঁসির দড়ি। ভাবতে গেলে কান্না পায়। পায়ের তলায় মাটি

সরে সরে যায়। গলা বুক শুকিয়ে আসে। দুচোখ সত্যি সত্যি জলে ভরে যায়। রাগে নিজের ওপরেই হিংস্র কিছু করে বসতে ইচ্ছে করে। সকলের অগোচরে বাথরুমে ছুটে যেতে হয়। চোখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে আসতে হয়। তারপর চোখ মুখ মুছে পাউডার বুলিয়ে নিলেই সক্কলের চোখে সপ্রতিভ স্মার্ট। ...যে কাণ্ড এ পর্যন্ত অনেকবার ঘটে গেছে। আবারও সেই কাণ্ড! সেকশন অফিসারের সঙ্গে সামান্য কারণে কথা-কাটাকাটি, তারপরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা বাস্তায়। মুক্তির স্বাদ। তারই সঙ্গে অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। মুক্তির স্বাদ থেকে দিনে দিনে আতঙ্কটাই বড় হয়ে উঠছে। শুভার্থীজনেদের উপদেশ শ্লেষের মতো কানে বেঁধে। লিখে আবার এ-দেশের মানুষ খেতে পরতে পায়। নিজের চেষ্টায় আর রোজগারের সর্বস্ব খুইয়ে এ-পর্যন্ত চার-চারটে উপন্যাস ছাপা হয়েছে কিন্তু এতটুক আলোর হদিস কোথাও নেই। কেউ চেনে না। কেউ জানে না। পাবলিশারের কাছে খোঁজ নিতে গেলেও মুখঝামটা খেতে হয়–বই বিক্রি হয় নি। হলেও হিসেব চাইলে আবার মুখঝামটা। মাসিকে সাহিকে লেখা পাঠালে অবধারিত ফেরত। পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দরজায় ধর্না দিলেও কেউ উল্টে দেখতে চায় না। সম্মানবোধ প্রহর, অথচ সর্বদা মাথা নিচু। আত্মীয়-পরিজনের করুণার পাত্র। ...নির্জন দুপুরে ছাতে উঠেছে। তারপর সভয়ে সরে গেছে। নিচের দিকে তাকাতে কে যেন মন্ত্রণা দিচ্ছিল, ইচ্ছে করলে এক্ষুণি সব যন্ত্রণার শেষ হতে পারে।...মায়ের ঠাকুরঘর। ভিতরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। তারপর মায়ের পটের সামনে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। মা-গো শুধু এই দাও, যেন কোনদিন কারো গলগ্রহ হতে না হয়..মা কি শুনল? নইলে দুমাস না যেতে হ্যাং অমন যোগাযোগ কেন? যেখানে ফিচার লিখে ভিক্ষের মতো পাচিশ তিরিশ টাকা করে হাত পেতে নিতে হত, সেখান থেকেই গল্প লেখার আমন্ত্রণ পেল কেন–গল্পের পরে উপন্যাস লেখার ফরমাস!...সেই থেকে বৃত্তবদল। বাজারে ফি বছর দুতিনটে করে উপন্যাসের জমজমাট বিক্রি। কটি উপন্যাস সিনেমায় পরপর হাট। প্রকাশকরা যেচে আসছে। ছবির প্রযোজকরা খাতির করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছেও খাতির কদর বেড়ে চলেছে।..সুরা সরকারের ফোন। খিলখিল হাসি। আপনি প্রোডিউসারের কাছে আপনার গল্পের নায়িকা হিসাবে আমার নাম সাজেস্ট করেছেন শুনলাম, অনেক

www.bengaliebook.com

ধন্যবাদ। মঞ্জুশ্রী ওর সামনাসামনি অভিমান, কিছু বলছেন না নেই আমার অভিনয় আপনার ভালো লাগেনি! এই শটটা আর একবার নিয়ে দেখব?...রাতের শয্যায় কল্পনার পথ ধরে ওই দুই অভিনেত্রীকেই চোখের সামনে দেখা যায়। কখনো সুরমা সরকার। কখনো মঞ্জুশ্রী গুপ্ত। ভেতরটা লালায়িত হয়ে ওঠে। হাত দুটো পাশবালিশের ওপর নিশপিশ করে। ইচ্ছে করলেই কল্পনায় ওদের খুব কাছে টেনে আনা যায়। তারপরেই হাতের ধাক্কায় পাশবালিশটা ছিটকে মাটিতে পড়ল। আবার? আবার পাপ? গায়ত্রীকে। মনে নেই? গায়ত্রী কিভাবে শুচিশুদ্ধ হল মনে নেই?...সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে। ইন্দিরার ওপর। ওধারে ঘুমে বিভোর হয়ে লতিয়ে পড়ে আছে। ও জেগে থাকলে তো এরকমটা হয় না। ভালো যাকে বাসে সে ইন্দিরা ছাড়া আর কে? ফের মিথ্যে? অন্তত নির্জলা সত্যি কি?...ইন্দিরা যখন তোমার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমোয় তখনো কি এক-একসময় ওই রমণী-দেহকে কেন্দ্র করে সিনেমার অভিনেত্রী ছেড়ে তোমার বইয়ের নায়িকারা পর্যন্ত কেউ কেউ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে হাজির হয় না?...

প্রশান্ত মিত্র নোটবই বন্ধ করলেন। কলমও। সিগারেট না খেয়ে পারা যাচ্ছে। না। হাঁক দিলেন, মহেশ!

মহেশ এলো।

–তোর মা কোথায়?

–এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।

–চলে গেলে ডেকে দিস।

সাত আট মিনিটের মধ্যে ইন্দিরা এলেন। –ডাকছিলে?

–হ্যাঁ। বড় তেষ্টা।

–সে কি! ইন্দিরা সচকিত। –মহেশ কোথায়, এক গেলাস জলও দিতে পারেনি?

www.bengaliebook.com

–জলের তেষ্টা নয়। সিগারেটের।

ইন্দিরা থমকে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ।–আজ এরই মধ্যে একটা বেশি খেয়েছ না?

মুখ কাচুমাচু প্রশান্তবাবুর।–তাহলে অন্তত আধখানা...

ইন্দিরা হেসে ফেললেন।–কি যে করো না তুমি! সত্যি আধখানা কেটে আনছি।

দু মিনিটের মধ্যে ফিরলেন। হাতে আধখানা সিগারেট আর দেশলাই।

প্রশান্তবাবু সিগারেট ধরিয়ে আরাম করে বড় টান দিলেন। ইন্দিরা মোড়া টেনে। বসলেন।

–কে এসেছিল?

–এই বাংলার সম্পাদক সঞ্জয় ঘোষ। তোমার শরীরের খবর নিচ্ছিলেন, কিন্তু আসল মতলব কবে থেকে তোমাকে লেখানো যাবে জানা। ওঠার আগে বলেই গেলেন, এবারে প্রথম যে লেখাটি ধরবে সেটা তার–তোমাকে যেন বলে রাখি।

আধখানা সিগারেট আর দুতিন টানে ফুরিয়ে এলো। ইন্দিরা বললেন, তার খানিক আগে তোমাদের প্রোডিউসার বিজন চাকলাদার ফোন করেছিলেন, তোমার কি গল্প নিয়ে জরুরী আলোচনা দরকার। আমি বলে দিয়েছি সামনের সপ্তাহের আগে হবে না–তাও কেমন থাকো না থাকো ফোন করে আগে জেনে নিতে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, আসতে বললেই পারতে, টাকাও তো দরকার।

-থাক। যা আছে ওই দুটোর উচ্ছন্নে যাবার মতো যথেষ্ট। নিজের বিশ্রামের কথা ভাবো।

www.bengaliebook.com

প্রশান্তবাবু হাসলেন।ওদের ওপর তোমার এত রাগ কেন? সুশান্ত চাকরি করবে কি করে, চাকরির নামেই আমার তো হৃৎকম্প হত। আর অনীতা-তো বলেই দিয়েছে এম. এ পাশ করার পর বিয়ের কথা।

ইন্দিরা অখুশি মুখ করে জবাব দিলেন, জানি না বাপু, কারো মতিগতি বুঝি না।

কটা দিন ভেতরটা বেশ হালকা লাগছিল প্রশান্তবাবুর। মনের বিজ্ঞানীরা বলেন, নিজের ভেতর দেখা গেলে অনেক দুর্বোধ্য বা অগোচরের জট খুলে যায়, স্নায়ু শিথিল হয়, বশেও থাকে। প্রশান্তবাবুর সদ্য অনুভূতিও অনেকটা সেই গোছের। কিন্তু পরের ছসাত দিন আর ওই নোটবই খুলে বসার অবকাশ পেলেন না। ছেলেমেয়ে আর সপরিবারে শ্যালক এসেছে দিল্লি থেকে। ভগ্নিপতির অসুস্থতার খবর পাওয়ার পর থেকেই আসতে চেষ্টা করছিল।

ছদিন বাদে তারা চলে যাবার পর এতবড় বাড়ি আবার খালি। বিকেলের দিকে ইন্দিরা কি কাজ সারতে বেরিয়েছেন। ছেলেমেয়েও বাড়ি নেই। প্রশান্তবাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে। সামনের কাঠের টুলে সেই মোটা বাঁধানো নোটবই আর কলম। ওটা খুলে বসার জন্য ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে লালায়িত হয়ে উঠেছিল। এই রকম নিরিবিলি ফুরসতের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ভিতরের যে মানুষটা ওই হিজিবিজি চিন্তার মিছিলের নায়ক, আয়নায় দেখার মতো তাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কারণ প্রশান্তবাবুর মতো সেও এক পরিণতির মোহনার দিকে পা বাড়িয়েছে। তফাৎ শুধু, তার সত্তা সকলের দেখা সকলের জানা প্রশান্ত মিত্রর থেকে বরাবরকার মতো আজও বিচ্ছিন্ন। নোটবই খুলে প্রশান্তবাবু কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে! কতক্ষণ আর কতটা এমনি নামের আশ্রয়ে একাগ্র হতে পারলে ভিতরটাকে নিরাসক্ত নির্লিপ্ত করা যায়? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...। টেলিফোন।...হ্যালো। হ্যাঁ বুঝেছি। শুনুন বনবাবু, বই পেয়েছি। গুনে দেখেছি সমস্ত বইয়ে তিরিশটা ছাপার ভুল। আর আপনাকে বই দেব কিনা

www.bengaliebook.com

ভাবতে হবে। আপনার পাবলিসিটিও আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না। যাক, পুরো তিন এডিশনের টাকা পাঠিয়ে দিন। আচ্ছা।...হরে রাম হরে রাম...বই লেখাটা নেশা না টাকা রোজগার নেশা? একটার সঙ্গে আর একটা। তফাৎ করা যায় না। যেমন গোলাপ আর তার গন্ধ। তফাং করা যায় না। এই পৃথিবীতে আসা কেন? গাদা গাদা বই লিখতে? আর টাকা রোজগার করতে? ঠিক আছে, অনেক ই অঢেল টাকা–তারপর কি? তারপরে কিছু না থাকলে ভিতরটা আশ্রয়। খোঁজে কেন? সেটা কেমন আশ্রয়? তার ঠিকানা কি? হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...। টেলিফোন। হ্যালো...না, অনীতা বাড়ি নেই। জানি না। জানি না। ..মেয়েটার চালচলন আবার অন্যরকম ঠেকছে। আবার কার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল কে জানে? প্রায়ই এই গলার ফোন আসে। একবার ঘা খেয়েও মেয়েটার শিক্ষা হয়নি। বিকেলে বেরোয় রাত করে ফেরে। খুব বুদ্ধিমতী ভাবে নিজেকে। সকালের কাগজ খুলেই অঘটনের ছড়াছাড়ি। সেভাবে কাগজ পড়ে না, সাবধান হওয়ার দরকারও ভাবে না। অঘটনের বরাত যেন সব সময়েই অন্যদের, ওদের নয়!...শুধু মেয়ে কেন, ছেলেটাও কোন রাস্তায় হাঁটছে ঠিক নেই। মেয়েদের ফোন তো লেগেই আছে। বাপ প্রেমের গল্প লেখে আর বাপের পয়সায় খেয়ে ছেলে প্রেম করে। মা সেভাবে বেঁকে না বসলে একবার তো কোন যাত্রাপার্টির মেয়ে এনে ঘরে ঢুকিয়েছিল প্রায়! যাকগে, ভেবে কি হবে? যার যেমন অদৃষ্ট। হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম...। টেলিফোন। হ্যাঁ-লো।...হা শর্মাজী বলুন। ছবি সুপারহট শুনেছি। থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু গল্পের পিছনে আপনি এভাবে লেগেছিলেন বলেই এতটা সাকসেস।...কোন গল্পটা? ও হ্যাঁ...না এখনো কনট্রাক্ট হয়নি, ফ্রী আছে। বেশ তো, কিন্তু এতবড় সাকসেসের পর নতুন গল্পে লেখকও একটু বাড়তি মর্যাদার আশা খে-হাঃ হাঃ হাঃ।...বাংলার সঙ্গে হিন্দীও কনট্রাক্ট হবে? ওয়া শুরফুল! ঠিক আছে, একটা দিন দেখে সকালের দিকে চলে আসুন, নময়ার নমস্কার।..বাংলা হিন্দী একসঙ্গে কনট্রাক্ট মানে খুব কম হলেও পঞ্চাশ হাজার টাকা। সাদা কালো আদাআধি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণের বাতাসটুক বেশ মিষ্টি লাগছে। বাঃ ভারী সুন্দর দেখতে তো মেয়েটা! ফর্সা লম্বা সুঠাম স্বাস্থ্য। মেয়েটা নয়, কারো ঘরের বউ হবে। রাস্তার অনেক জোড়া চোখ টেনে হেসে হেসে আর এক মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে বলতে

চলেছে।...ধেং! সুন্দর মেয়ে মিষ্টি মেয়ে দেখতে সকলেরই ভালো লাগে– ভালো কথা। কিন্তু তিরিশ বছর আগের চোখ দিয়ে দেখা কেন? ছিঃ! হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে

পরদিন সকালে বেশ হাসি-হাসি মুখে ইন্দিরা ঘরে ঢুকলেন। তার হাতে একখানা এই বাংলা মাসিকপত্র। কাছে এসে ওটা খুলে প্রশান্তবাবুর সামনে ধরলেন। তাতে ছবিসহ অনন্য লেখক প্রশান্ত মিত্রর দ্রুত আরোগ্য-সংবাদ। ফাঁকে ফাঁকে তার প্রতিভার প্রশস্তি! বিশেষ করে তার চরিত্রচিত্রণ আর বিশ্লেষণ ক্ষমতার ঢালাও প্রশংসা।

হাসিমুখে এই বাংলা ইন্দিরাকে ফেরত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তবাবুর কি মনে হল। চট করে উঠে কালো নোটবই আর কলমটা নিয়ে পাশের লেখার ঘরে। চলে গেলেন। এতে কিছু লিখে আবার চার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলেন।

ইন্দিরা অবাক একটু।–কি হল, এই থেকেই আবার নতুন কিছু প্লট মাথায় এসে গেল নাকি!

প্রশান্ত মিত্রর ঠোঁটের হাসিটুকু রহস্যের মতো। নোটবই যথাস্থানে অর্থাৎ ডেকে রাখতে রাখতে জবাব দিলেন, ওই তেলের প্লট নিয়ে গপপ তো কত বারই লেখা হয়ে গেছে!

.

দিন কুড়ি বাদে নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়ার মতোই ঘটে গেল– ব্যাপারটা। লেখক প্রশান্ত মিত্র চিকিৎসার চার ঘণ্টা সময় দিলেন না। ডাক্তাররা বললেন, ম্যাসিভ স্ট্রোক। বাংলা সাহিত্য জগতে নিখাদ শোকের ছায়া নেমে এলো। প্রশান্ত মিত্র নেই।

দিন যায়। একটা মাস গড়ালো। শোকের স্তব্ধতা থেকে ইন্দিরাকেও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে হল। এই নিয়ম।

www.bengaliebook.com

কদিন ধরে টেলিভিশনের লোক এসে এসে ঘুরে যাচ্ছে। তাদের প্রস্তাব, প্রয়াত অনন্য লেখকের সাহিত্যজীবন আর ঘরের জীবন নিয়ে স্বয়ং ইন্দিরা মিত্র একটা প্রোগ্রাম করুন। এই প্রোগ্রাম শত সহস্র দর্শক শ্রোতার কাছে পরম সমাদরের জিনিস হবে।

কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় ইন্দিরা টিভির লোকের সঙ্গে দেখাই করেন নি। ছেলেমেয়ে অনুরোধ করেও ফিরে গেছে। আজ আবার এসেছে। সুশান্ত অনীতা দুজনেই তাগিদ। দিচ্ছে, নিচে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু আলাপ করো না মা, এই নিয়ে তিন দিন এলেন।

-বসতে বল।

ইন্দিরা উঠলেন। পরনের শাড়িটা খুব পরিষ্কার নয়। বদলালেন। সেই মুহূর্তে স্বামীর সেই নোটবইটার কথা মনে হল তার। চরিত্রচিত্রণের প্রসঙ্গে কি-ভাবে না কেটে স্বামী কি করতেন, দেখাবেন।

বার করলেন। শেষের দিকের কটা দিন কি আঁকিবুকি করেছেন দেখার জন্য ওটা খুললেন। তারপরেই অবাক একটু। আঁকিবুকি নয়, লেখা। বিছানায় বসে পড়তে লাগলেন। যত পড়ছেন ততো গম্ভীর।

একেবারে শেষের কটা লাইন–ওপরে তারিখ দেওয়া। ...মানুষের চরিত্র নিয়ে। সমস্ত লেখক জীবন ধরে যে এভাবে ভাওতাবাজী করে গেলাম, নিজেই জানতাম না। যে লোক নিজের চরিত্রের ঠিকানা জানে না, হদিস জানে না, সেই লোক অনন্য চরিত্রস্রষ্টা–এর থেকে হাসির ব্যাপার আর কি হতে পারে!

ইন্দিরা নিষ্প্রাণ স্তব্ধ মূর্তির মতো বসে আছেন। ছেলে আবার তাগিদ দিতে এলো, মা এলে না?

-না, চলে যেতে বল।

মায়ের এই মুখ দেখে আর তার হাতে এবার কালো নোটবই দেখে ছেলে স্মৃতির শোক ভাবল। বলল, তাহলে আর এক দিন আসতে বলি?

www.bengaliebook.com

–কোন দিন না। আমার দ্বারা এ-সব হবে না বলে দে।

নোটবইটা হাতে নিয়ে ইন্দিরাই আগে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সহাবস্থান

মস্ত বাড়ি, দুতিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকাপয়সার ছড়াছড়ি-কিন্তু এমন পরিবারেও কি ঝগড়া-ঝাটি, খিটিমিটির লেগেই থাকে না? অথচ স্বভাবে দুজনের একজনেও ঝগড়াটে নয়?

প্রশ্নটা আমাকে করেছিল বোম্বাইয়ের মাস্টার সাহেব।

বোম্বাইয়ের মাস্টার সাহেব বলতে সেখানকার লোক নয়। বাঙালী। পঁচিশ বছর বয়সে ভাগ্য ফেরানোর চেষ্টায় বম্বে চলে গেছল। বেশ শক্তসমর্থ পুরুষের চেহারা ছিল তখন। বি-এ পাশ। বাপ দাদা কেরানী। ফলে কেরানীগিরির ওপর ঘেন্না। কলকাতার। সিনেমা এলাকায় কিছুকাল ঘোরাঘুরি করেছে। আর এদিকে এক চৌকস হিন্দুস্থানী শিক্ষকের কাছ থেকে বেশ মন দিয়ে হিন্দী শিখেছে। তার জন্য পয়সা খরচ করতে হয়নি। তার আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক নিজেই যত্ন করে শিখিয়েছে। হিন্দীর দুদুটো ডিপ্লোমা পরীক্ষায়ও ভালো পাশের সার্টিফিকেট তার ছাত্রের পকেটে এসেছে। মোট কথা, কলকাতায় সুবিধে হল না দেখে মাস্টার সাহেব (তখন নাম অমর ঘোষ) যখন বোম্বাই পাড়ি দিয়েছিল, তখন সে টগবগ করে হিন্দী বলতে পারে, ইংরেজী বলতে পারে।–বাংলা তো পারেই।

কিন্তু অর্থভাগ্যটা কোনদিনই তার সুবিধের নয়। বোম্বাইয়ের ছবির বাজারে তখন রাজপুত্র মার্কা হিরোর কদর। অনেক কষ্টেও ভদ্রলোক পাত্তাই পেল না। ছোটখাটো রোলে কিছু চান্স পেয়েছিল। কিন্তু সেখানে তৃতীয়-চতুর্থ সারির আর্টিস্টদের কোন অস্তিত্বই নেই। নায়ক-নায়িকা ছেড়ে টেকনিসিয়ানদেরও তারা করুণার পাত্র। কিন্তু একজন মাঝারি প্রোডিউসারের চোখে তার যে গুণটি ধরা পড়েছিল সেটা অভিনয় নয়। সেই প্রয়োজকটির নাম অজিত বরিসকর। তার একটি বুদ্ধিমান কর্মঠ বিশ্বস্ত

লোকের দরকার ছিল। সে সোজাসুজি তাকে বলেছিল, অভিনয়-টভিনয় কোনোদিন তোমার দ্বারা হবে না। আমার এদিকের হিসেবপত্র রাখা, আর বাড়িতে তিনটি ছেলেকে পড়ানোর জন্য একজন ভালো লোক দরকার। এজন্য মাস গেলে আমি তোমাকে তিনশো টাকা মাইনে দেব। থাকার জন্য আমার বাড়িতেই আলাদা ঘর পাবে–বিনে পয়সায় খাওয়া-দাওয়াও পাবে। সকালে ছেলে পড়াবে, দুপুরে স্টুডিওতে এসে আমার কাজকর্ম দেখবে। ছোটখাটো এক-আধটা রোল যদি পাও করবে–সেটা তোমার বাড়তি রোজগার।

মাস্টার সাহেব অর্থাৎ অমর ঘোষ এককথায় রাজি হয়ে গেছল। তার তখন রাতিমতো দৈন্যদশা চলেছে। যত্রতত্র খাওয়া আর যত্রতত্র শোওয়া। আশা করেছিল বরিসকর সাহেবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে পেলে একদিন তার অভিনয়েরও কদর হবে। তা আর হল না। সেই থেকে সে মাস্টার সাহেব। ছোট ভূমিকায় অভিনয়ে নামলেও পর্দায় নাম লেখা থাকে মাস্টার সাহেব। এতদিন নিজের ম নিজেই সে ভুলতে বসেছে, কারণ নাম বললে চেনা মহল বা স্টুডিও মহলের কেউ তাকে চিনবে না।

বয়েস এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। একমাথা কঁচা-পাকা চুল। ফর্সা কোনদিন ছিল না, গায়ের রঙে এখন আরো পোড় খেয়েছে। তবে এখনো সুশ্রী, আর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। নিজের ভাগ্য নিয়ে আর কোন আক্ষেপ নেই। বরং বেশ হাসিমুখে কৌতুকরসে জারিয়ে নিজের দুর্ভাগ্যের গল্প করতে পারে। এখন এক স্টুডিও এলাকাতেই নামমাত্র ভাড়ায়। একখানা ঘর নিয়ে আছে। সেই স্টুডিওর খাতাপত্র দেখার চাকরি করে, মাইনে সর্বসাকুল্যে চারশো। বোম্বাই শহরে এ-টাকায় মাস চালাতে হলে প্রতিটি পয়সার হিসেব রেখে চলতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ বেজার মুখ দেখে না তার।

এই বয়সেও এত কম মাইনে। তার কারণ আছে। স্টুডিওর এই চাকরি খুব বেশি দিনের নয় তার। মাত্র দেড়-দু বছরের। তাও আগে চেনা-জানা ছিল বলে স্টুডিওর মালিকরা দয়া করে তাকে এই কাজটুকু দিয়েছে। চাপাচাপি করলে মাইনে আরো কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু মাস্টার সাহেব তা করে না। দিব্যি চলে যাচ্ছে। নিজে রেধে খায়, আর নেশার মধ্যে শুধু বিড়ির খরচ।

www.bengaliebook.com

এখানকার চাকরির আগে মোটামুটি ভালভাবেই দিন কেটেছে তার। টানা বারো তেরো বছর অজিত বরিসকরের কাছে বাড়ির লোকের মতোই ছিল। সেই ভদ্রলোকের ছোট ছেলেটাও সেকেণ্ডারি পাশ করে বেরিয়ে যাবার পর মাস্টার সাহেবের ডাক পড়েছে। তার বড় মেয়ের বাড়িতে। বড় মেয়ের নাম শীলা। বিয়ের পর তিড়কে হয়েছে। মাস্টার সাহেব যখন বরিসকর বাড়ির বাসিন্দা, শীলার বয়েস তখন উনিশ-কুড়ি। আরো বছর দেড়েক বাদে দিলাপ তিড়কের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। তাদের পৈতৃক ব্যবসা। শীলাদের থেকেও বড় অবস্থা। মেয়ে পছন্দ হতেই তুলে নিয়ে গেছে। পছন্দ হবার মতো মেয়ে তো বটেই। কলেজে পড়ে, চেহারাপত্রের চটক খুব, কালো চোখের শরে পুরুষ ঘায়েল করার কেরামতি রাখে। বিয়ে হবে না কেন! বিয়ের একমাস বাদে দিলীপ তিড়কে লণ্ডন চলে গেছল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়তে। বছর দুই বাদে ধৈর্য খুইয়ে চলে এসেছে। শালা ততদিনে এক ছেলের মা। বিয়ের নমাসের মধ্যেই তার ছেলে হয়েছে। ছেলের অন্ন প্রাশনের উৎসবে দিলীপ তিড়কে সাত দিনের জন্য এরোপ্লেনে চেপে চলে এসেছিল। ধুমধামের পর আবার ফিরে গেছে।

যাই হোক, দিলীপ তিড়কে ফিরে আসার দশ-বারো বছরের মধ্যে শীলার আরো দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে হয়েছে। তার বছর কয়েকের মধ্যে শীলার ছোটভাইয়ের পড়া সাঙ্গ হতে বাপের কাছে আব্দার জানিয়ে মাস্টার সাহেবকে নিজের বাড়িতে এনে তুলেছে। আর ছেলেমেয়েদের পড়ানোর ভার তার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। শিক্ষক হিসেবে মাস্টার সাহেবের গুণ কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কারণ শীলার তিন তিনটি সাদা-মাটা ভাই-ই দিব্যি ভালো রেজাল্ট করে বেরিয়ে এসেছে।

তিড়কের বাড়ি এসে মাস্টার সাহেবের দিন আরো ভালো কেটেছে। বাড়ির কর্তা। অর্থাৎ শীলা কে সম্ভ্রমের চোখে দেখে, অন্যেরাও তাকে কিছুটা সমীহ করে চলবে বইকি। তার ওপর দিলীপ তিড়কে কিছুটা নির্বিলিক মানুষ। তারও গো আছে বটে, কিন্তু না ঘটালে সে কারো সাতে-পাঁচে নেই। মাস্টার সাহেবের মাইনে সর্বসাকুল্যে তখন সাড়ে সাতশো টাকা। শীলা দেয় সাড়ে চারশো, আর স্টুডিওর কাজের জন্য তার বাপ নেয় তিনশো। প্রায় সবটাই

ব্যাঙ্কে জমা পড়ার কথা। খাওয়া-পরার খরচ এক পয়সা নেই। কিন্তু দুদুটো বড়লোকের বাড়িতে থাকার ফলে মাস্টার সাহেবের। একটু খারাপ অভ্যেস হয়ে গেছল। মদ খাওয়া ধরেছিল। এ-জিনিসটা দুবাড়িতেই জল-ভাত ব্যাপার। আর সিগারেট খরচাও ছিল তখন। তখন তো আর বিড়ি ফুকত না। বছর দুই আগে বলা নেই, কওয়া নেই, বাড়ির মেজাজা কত্রী শীলা তিড়কে হুট করে তাকে বিদায় করে দিতে বেশ ফাঁপরে পড়েছিল মাস্টার সাহেব। এ-রকম হবে। বা হতে পারে ভাবেনি, কারণ তখনো তার ছোট ছেলের স্কুলের পড়া শেষ হতেই বেশ বাকি। আবার ততদিনে মাস্টার সাহেবের সিনেমার চাকরিও গেছে। শীলার বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে ব্যবসায় যবনিকা পড়েছে। বাবার দেওয়া মাইনেটাও শীলা পুষিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটার, এখন আর মেয়েটার নয়, মহিলাটির এমনিতে দরাজ মন, কিন্তু তার মেজাজ বোঝা ভার। মাস্টার সাহেবও কোনরকম আবেদন না জানিয়ে চলেই এসেছে। তারপর এই স্টুডিওর চাকরিটুকু জোটাতে পেরে নিশ্চিন্ত।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে এই স্টুডিওতেই গেল বছরে আলাপ আমার। নিজের গল্পের একটা ছবির কাজেই কিছুদিন ছিলাম। লোকটিকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার অঢেল সময়। তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তার হাতের রান্নাও খাইয়েছে আমাকে। তখনই নিজের জীবনের গল্প করেছে।

এবারেও ছবির কাজে আসা। আমাকে দেখে মাস্টার সাহেব ভারা খুশি। তার সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানিয়েছিল। বলেছিল, আপনার মতো একজনের সঙ্গে আমার খাতির দেখলে এরাও আমাকে একটু অন্য চোখে দেখবে। সেটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু আড্ডা দিতে তার ঘরে প্রায়ই গেছি।

স্টুডিওতে বসেই আমার আগামী ছবির বাঙালী ডাইরেক্টরের সঙ্গে স্ক্রিপট নিয়ে একটু কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অকারণ ঝগড়া আর বচসার ব্যাপারগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিল না। মাস্টার সাহেব সেখানে চুপচাপ বসেছিল। শুনছিল। পরে তার ঘরে ধরে এনে চা খেতে খেতে প্রথমেই ওই প্রশ্ন। যথা, মস্ত বাড়ি, দু-তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর

www.bengaliebook.com

টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি–এমন পরিবারে স্বামী স্ত্রর মধ্যে অকারণ ঝগড়াঝাটি লেগে থাকতে পারে কিনা! অথচ স্বভাবে দুজনের একজনও ঝগড়াটে নয়।

আমি কৌতূহল বোধ করেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ-রকম দেখেছ?

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, না দেখলে বলছি! অথচ আশ্চর্যভাবে এই ঝগড়াঝাটি, খিটির-মিটির একেবারে থেমে যেতেও দেখেছি।

তার চোখ-মুখের দিকে চেয়ে আমার কৌতূহল আরো বাড়ল। বললাম, ব্যাপারখানা বলো তো মাস্টার সাহেব–শুনি? সমস্ত জীবন তো মাস্টারি করে কাটালে, কোথায় দেখলে?

–এই মাস্টারি জীবনেই। গেলবারে দিলীপ তিড়কে আর শালা তিড়কের ছেলেমেয়েদের পড়াম–সে গল্প করেছি তো?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

–সেখানেই। দিলাপ আর শীলার মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ কি যে তুমুল লেগে যেত, আপনি ভাবতেও পারবেন না। ছেলেমেয়েরা ছেড়ে দিলীপ তিড়কেও স্ত্রর তিরিক্ষি মেজাজের হদিশ না পেয়ে প্রথমে হাঁ করে থাকত। পরে সে-ও ক্ষেপে যেত। আমার মাঝে মাঝে ভয় হত, এতগুলো ছেলেমেয়ে, কিন্তু এ-রকম অকারণে বা তুচ্ছ। কারণে দুজনের একটা ডিভোর্সের ব্যাপার না হয়ে যায়! এ-রকম বছরের পর বছর ধরে দেখেছি। তারপর মাত্র এই দুবছর আগে সব ঠাণ্ডা–স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সদ্ভাব।

মুখের দিকে চেয়ে মাস্টার সাহেব এমন টিপ টিপ হাসতে লাগল যে আমার মনে হল, গল্পের সবে শুরু। জিগ্যেস করলাম, বছরের পর বছর ধরে অত ঝগড়া কেন, আর পরে হঠাৎ সদ্ভাবই বা কেন–কেউ জানে না?

www.bengaliebook.com

-শীলা তিড়কে নিশ্চয় জানে, আর দিলীপ তিড়কের হয়তো ধারণা কোন বৈ অনুগ্রহেই স্ত্রীর মন-মেজাজ ঘুরে গেছে।... কিন্তু ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পারি বলেই শীলা তিড়কে হুট করে আমাকে জবাব দিয়ে বসল।

এরপর আমি শোনার জন্য উদগ্রীব। মাস্টার সাহেবও বলতেই চায়। সংক্ষেপে চিত্রটা এই রকমঃ

...শীলা তিড়কের এখন বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। কিন্তু এখনো দেখলে কেউ চল্লিশ ভাববে না। মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করেছে তার মনমেজাজ বিগড়োতে শুরু করেছে বছর সাত-আট আগে থেকে। কারণে অকারণে ক্ষেপে যায়। রাগ সব থেকে বেশি স্বামীর ওপর। সে বেচারা যতক্ষণ পারে সহ্য করে। তারপর সে-ও পালটা ঝাঁপটা মারতে আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে তটস্থ তখন। কারণ ঝগড়ার পরের জেরটা প্রায়ই ওদর ওপর এসে পড়ে। রাগারাগির পর ওদের বাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর মা ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে পড়ে। তুচ্ছ কারণে মারধোরও করে। মাস্টার সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করলে তাকে সুষ্ঠু চোখের আগুনে ভস্ম করতে চায়। এরই মধ্যে শীলা তিড়কের আবার ধর্মে মতি এসেছে কিছু। নিজের একটা ঠাকুরঘরও করেছে কিন্তু ধর্মে মন দিলে সাধারণত মেজাজপত্র ঠাণ্ডা আর সুস্থির হতে দেখা যায়। শীলা তিড়কের ঠিক উল্টো। দিনে দিনে আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

এদিকে দিলীপ তিড়কে তার ব্যবসা নিয়ে সত্যি ব্যস্ত। ব্যবসার কাজে প্রায়ই তাকে বোম্বাইয়ের বাইরে বেরুতে হয়। বেশি যায় গোয়ায়। গোঁয়ার সঙ্গে কিছু আমদানি রপ্তানির যোগ আছে। সেখানে তার এক খুড়তুতো ভাই ব্যবসার দেখাশুনা করত। বছর চারেক আগে সেই ভাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় দিলীপ তিড়কের আরো ঘন ঘন গোয়ায় যেতে হয়। অন্য দায়ও আছে। সেই খুড়তুতো ভাইয়ের দুটো ছেলে। ভাই মারা যাবার সময় একজনের বয়েস চার, আর একজনের দেড়। ওদের বা ওদের মায়ের তখন একমাত্র দিলীপ তিড়কে ছাড়া তিন কুলে আর কেউ নেই। পরের এই কটা বছরে সেই ভাইয়ের বউটি ব্যবসার কাজ মোটামুটি বুঝে নিয়েছিল। বম্বে টু গোয়া দূর কিছু নয়। দিলীপ তিড়কের সেই ভাই জীবিত থাকতেও শীলা কোনদিন

তাদের বম্বে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপ্যায়ন করেনি। আশ্রিতদের সে আশ্রিতের চোখেই দেখে। সেই ভাই মারা যাবার পরেও তাদের ডাকেনি। মাস গেলে মাসোহারা যাচ্ছে, এর বেশি আর কি করার আছে? স্বামীকে সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে তোমার ভাইয়ের বউকে ওখানকার ব্যবসার কাজ একটু আধটু বুঝে নিতে বলো–শুধু দয়ার ওপর কতকাল আর চলতে পারে! দিলীপ তিড়কে খুশিমুখে স্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল।

যাক, বাড়ির অশান্তি এদিকে বাড়ছেই-বাড়ছেই। শীলা তিড়কের উঠতে বসতে রাগ। স্বামী ঘরে থাকলে রাগ, ব্যবসার কাজে ব্যস্ততা বাড়লে রাগ, আগের মতো উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে পারে না বলে রাগ, আবার পূজোআর্চায়ও মন দিতে পারে না বলে রাগ। এরই মধ্যে এই পরিবারে আবার একটা বড় রকমের পরিবর্তন দেখা দিল। নিজের চার-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়েই অস্থির আর অসহিষ্ণু শীলা তিড়কে, তার মধ্যে বলা নেই, কওয়া নেই, হুট করে আরো দু-দুটো নাবালককে গোয়া থেকে বোম্বাইতে তুলে নিয়ে এলো দিলীপ তিড়কে।

ভদ্রলোক সত্যি নিরুপায়। কারণ গোঁয়ার সেই ভাইয়ের বউও তিন দিনের অসুখে দুম করে মারা গেল। তার বড় ছেলেটার বয়েস তখন নয়ের কাছাকাছি, আর ছোটটার। ছয়। ভারী মিষ্টি ছেলে দুটো। দেখলে মায়া হয়। আর বোঝা যায়, ওদের বাবা বা মায়ের দুজনের একজন অন্তত ভারী রূপবান বা রূপসী ছিল। শীলা তিড়কে যে। মেজাজের মহিলাই হোক, স্বামাকে খুব একটা দোষ দেবে কি করে? বাপ-মা-মরা ছেলে দুটো যাবে কোথায়? অসষ্ট হলেও এ নিয়ে খুব একটা রাগারাগি করতে পারল না। দিলীপ তিড়কে আশ্বাস দিল, আর একটু বড় হলেই ছেলে দুটোকে হস্টেলে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ভদ্রলোকের বুকের তলায় বেশ একটা নরম জায়গা আছে বটে। স্ত্রীর ভয়ে বাইরে কোনরকম হাঁক-ডাক নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অসহায় ছেলে দুটোর প্রতি সজাগ চোখ। চুপচাপ ওদের ভালো স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে। মাস্টার সাহেবকে চুপি চুপি অনুরোধ করে ওদের দুজনের জন্য আলাদা

একজন টিউটর রাখা হয়েছে। বড়ঘরের ছেলের মতোই ফিটফাট পোশাক-আসাক ওদেরও।

এরই মধ্যে মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করছে, শীলা তিড়কে হঠাৎ কি-রকম গুম মেরে যাচ্ছে। তার চিৎকার চেঁচামিচি রাগারাগি কমে আসছে। সব দেখে লক্ষ্য করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মাস্টার সাহেবের ভয়, খুব বড় রকমের কিছু বিস্ফোরণের লক্ষণ এটা।

মাস চারেক বাদে এক দুপুরে খোদ কত্রীর শোবার ঘরে ডাক পড়ল মাস্টার সাহেবের। ছেলেমেয়েরা সব স্কুলে। দিলীপ তিতকে অফিসে। মাস্টার সাহেব পড়ার ঘরে বসে বই পড়ছিল। নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেল।

সেই থমথমে মুখ দেখেই প্রমাদ গুনছিল মাস্টার সাহেব।

শালা খুব ঠাণ্ডা গলায় তাকে কিছু বলল, তারপর কিছু হুকুম করল। সেই হুকুম মতো সেই দুপুরেই মাস্টার সাহেব গোয়ায় চলে গেল। তার বুকের তলায় সর্বক্ষণ তখন হাতুড়ির ঘা। দুদিন বাদে ফিরল। বুকের তলায় তখন এক ধরনের হিংস্র আনন্দ। এই পরিবার এখন তছনছ হয়ে যাবে–এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়তো আর কেউ রুখতে পারবে না।

ফিরেছেও দুপুরে। বাড়িতে যখন আর বিশেষ কেউ নেই। শীলা তিড়কে আবার তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখে মাস্টার সাহেব তাকে সমাচার জানালো। তার সন্দেহ সবটাই সত্য। গোয়াতে দিলীপ তিড়কের কোনরকম ভাই বলে কেউ ছিল না। ওখানকার ব্যবসা দেখার দায়িত্ব নিয়ে একজন খুব রূপসী মহিলা নিযুক্ত ছিল। সেখানকার লোক জানে দিলীপ তিড়কে পরে তাকে বিয়ে করেছে। ছেলে দুটো তাদেরই।

এরপর শেষ দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল মাস্টার সাহেব। কিন্তু এমন শেষ দেখবে কল্পনাও করেনি। তাকে আবার একদিন চুপি চুপি ডেকে বলেছে, এ-খবর যেন প্রকাশ না হয়। আর পনের দিনের মধ্যে অন্য মূর্তি দেখেছে শীলা তিড়কের। সেই আগের মতো হাসি-খুশি, উচ্ছল স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে

www.bengaliebook.com

যায়, সিনেমায় যায়। বাড়ির ছটা ছেলেমেয়েকেই আদর করে, জিনিস কিনে দেয়, সমান চোখে দেখে।

মাস শেষ হতেই তিন হাজার টাকা মাস্টার সাহেবের হাতে নিয়ে বলল, প্রাইভেট টিউটর আর দরকার নেই–সে আর মিস্টার তিড়কে ছেলেমেয়েদের অন; ভাবে মানুষ করার কথা ভাবছে। তারা দুজনেই মাস্টার সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই পর্যন্ত বলে মাস্টার সাহেব থামল। আমি বিমূঢ় মুখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

ঘোরালো দুচোখ মাস্টার সাহেব আমার মুখের ওপর তুলে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার। বুঝলেন কিছু?

মাথা নাড়লাম। –না। একদিকে মহিলার এমন উদার পরিবর্তন, অন্যদিকে তোমার ওপর হঠাৎ বিরূপ কেন?

অনুচ্চ অথচ ক্ষোভ-ঝরা গলায় বিড় বিড় করে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, উদার পরিবর্তন না ছাই–সে নিজের এতকালের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেল। বিয়ের এক মাস বাদেই দিলাপ তিড়কে দুবছরের জন্য বিলেত চলে গেছল, আর নমাসের মধ্যে শীলার বড় ছেলে ঘরে এসেছে...সেই ছেলে দিলীপ তিড়কের নয়।

শুনে আমি হতভম্ব, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই জিগ্যেস করলাম, কিন্তু এ-রকম একটা ব্যাপার তুমি জানলে কি করে!

মাস্টার সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। গলার স্বরে চাপা বিরক্তি। জবাব দিয়ে মন্তব্য করল, কি-যে ছাইয়ের গল্প লেখেন বুঝি না!

www.bengaliebook.com